Prescribed Vernacular Text Book for the Matriculation Examination of the Calcutta University. Authorised by the D. P. I. for class VIII in H. E. Schools.

প্রতিভা।

রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত

Lives of Great men all remind us
We can make our lives sublime,
—*Longfellow.*

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয়।
—হেমচন্দ্র।

প্রকাশক—শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত।

রজনীকুটীর—২৮।১৬ অখিল মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরী ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পঞ্চম সংস্করণ—১৩১৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকারের জীবনী।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসের ২৯শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺ কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তেওতা গ্রামে মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়। সেই বাল্যকালে তিনি দুষ্ট জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চিরজীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চ কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা স্কুলে শিক্ষক থাকায় শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এণ্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতা স্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত কালেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে; এবং তাঁহার শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক্ আসন পাইতেন। সংস্কৃত কালেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে; তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যে অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরেজী ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই।

বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয় ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছু দিন পর... চন্দ্র কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থ য... মত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি সাব... গিরি যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায় বা চা... কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায়, তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতেই তাঁহার বাঙ্গালা রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁ... ছিল ও বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেব-চরিত বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশি... হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড ষ্টকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন

সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সংকল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্যচর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতি কষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোটেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া, পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন-বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সংকল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক।

রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্যচর্চ্চা জীবনের ব্রতস্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে, দুঃস ...তে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এইরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে অরণে ...। বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় নহে ...ণ আছে কি না, জানি না।

...ই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ...তির নিকট পরিচিত হন। ভূদেব বাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য অ... শ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করেন। অর্থাভাবে ইতিহাস লিখিয়াও মুদ্রিত করিতে পারিতেন না। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদ-পত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখকশ্রেণীর মধ্যে রজনী-কান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপরবৎসর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া, আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্টবুক কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইত। এইরূপে স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে

আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসা চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত ২রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমিপ্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহার হাতে গোটা দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু কষ্ট পান। চিকিৎসকেরা পিঠের ব্রণকে কার্ব্বঙ্কল স্থির করায়, তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে, সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া, জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোকে গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্র স্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্পসময়ের জন্য তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত

থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গসাহিত্যে রজনী-কান্তের অভাব তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিতজন কর্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকাল-মরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিবেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনী বাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি, আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনী বাবুর পরামর্শ না লইয়া, পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্যপ্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়-ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎপত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ খ্যাতিলাভের প্ররোচনায়

তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষং যে যে প্রধান কার্য্যে এপর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনার প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালারচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারের সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাবলম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস

আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি, সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ্‌ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র-ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায়, তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ, ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর

কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসার রাণী ও কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন। তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। দরিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

জাতীয় ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার অন্য উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্ম-সম্মান বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ককালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া, স্বজাতীয় গৌরব খ্যাপনের সহিত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া, আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জন-

সাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। "আমাদের জাতীয়ভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবের ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই এস্থলে অগ্রণী ও পথপ্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজ কাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজ কাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়াছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাহার ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কি না, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল; তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন

না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই এক জন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছেন কি না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না; এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে, সাহিত্য-মধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চে, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থের বা ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে এতটুকু বলা যাইতে পারে কি না, সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭। } শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিজ্ঞাপন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে যে সকল প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, উপস্থিত গ্রন্থে তাঁহাদের মধ্যে পাঁচ জন খ্যাতনামা লেখকের প্রতিভার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রধানতঃ এই পাঁচ জনের প্রতিভায় বঙ্গীয় সাহিত্যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধস্থাপনবিষয়ে এই পাঁচ জনই আপনাদের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং এই পাঁচ জনই বিবিধ উপায়ে স্বদেশীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিভার বিবরণ লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান কালের ইতিহাস। বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানিতে হইলে, ইঁহাদের প্রতিভার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

সৌভাগ্যক্রমে এই প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদিগের মধ্যে অনেকের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিষয় লিখিত হয়, তখন তদীয় সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্যতীত আর কেহ বিদ্যাসাগর-চরিত প্রকাশ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন কোন কথা এই জীবনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় অক্ষয়কুমারচরিত এবং শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, মহাশয় মধুসূদনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের [illegible] জীবনী হইতে অক্ষয়কুমার ও মাইকেল মধুসূদনের কোন কোন কথা পরিগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র হইতে এ বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি। এখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর

দুইখানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রবিশেষে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আশা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীও যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

উপস্থিত গ্রন্থের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য তিনটি প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ্-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ তিনটি প্রবন্ধ স্থল-বিশেষে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রথম প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থক সভায় পঠিত ও 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধও কোন কোন অংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রন্থের নাম "প্রতিভার পরিচয়" রাখা হইয়াছিল। পরিশেষে বন্ধু-বিশেষের প্রস্তাবে উহা কেবল "প্রতিভা" নামে প্রকাশিত হইল।
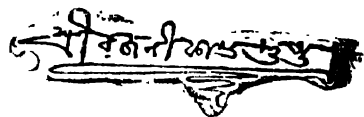
সূচী।

জন্ম।	মৃত্যু।
১২ই আশ্বিন, ১২২৭।	১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮।
মেদিনীপুরের অধীন বীরসিংহগ্রামে।	কলিকাতায়।

স্বগয় রচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রতিভা।

—ঃ*ঃ—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, বিলাস-বিদ্বেষ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা, পরার্থ-পরতা, সর্ব্বপ্রকার কঠোরতায় অপরাঙ্মুখতা, আমাদের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ছিল। হিন্দু ছাত্র যখন শাস্ত্রানুশীলনে মনোনিবেশ করিতেন, তাঁহাকে অতি কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইতে হইত। আপাত-রম্য সৌখীনভাবে তখন তাঁহার প্রবৃত্তি থাকিত না; বিষয়-বাসনার পঙ্কিল প্রবাহে তখন তাঁহার হৃদয় কলুষিত হইত না, উচ্ছৃঙ্খলতার সমাবেশেও তখন তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য উন্মার্গ-গামী হইয়া উঠিত না। তিনি তখন নানা কষ্ট সহিয়া, নানা বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, নানা দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিয়া, শারীরিক উন্নতির সহিত অপূর্ব্ব মানসিক শক্তির পরিচয় দিতেন। হিন্দু গৃহস্থ যখন গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহাকে পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইত। তিনি তখন আত্মসুখের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না; নিরবচ্ছিন্ন আত্মোদর-পূরণে আসক্ত থাকিতেন না; বা আত্মসমৃদ্ধির বিস্তার করিয়া, বিলাস-সাগরে

ভাসিয়া বেড়াইতেন না। তখন তাঁহার সমস্ত কার্য্য পরোপকারার্থে অনুষ্ঠিত হইত। পর-পরিচর্য্যাই তখন তিনি আপনার প্রধান ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার এই পবিত্র ব্রতের মহিমায়, রোগ-শোক-তাপময় সংসার শান্তি-নিকেতন-স্বরূপ হইয়া উঠিত। শ্যামল-পত্রাবৃত ফলপুষ্প-যুক্ত-বৃক্ষ যেমন স্নিগ্ধ ছায়ায় পথশ্রান্ত পথিকের শান্তি-বিনোদন করে, সুস্বাদু ফল দিয়া ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধাশান্তি করিয়া থাকে, শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া, শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয় দান করে, তিনিও সেইরূপ গৃহাগত ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষা দান করিয়া, জীবসমূহকে অন্ন দিয়া, অতিথি, অভ্যাগত ও আর্ত্তজনের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া, ভূলোকে স্বর্গীয় শোভা বিকাশ করিতেন। এইরূপ কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণুতার সহিত অদম্য উদ্যম ও অধ্যবসায়, এবং এইরূপ পরার্থ-পরতার সহিত সর্ব্বজন-হিতৈষিতা ও সর্ব্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্ত, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল কালের অনন্ত মহিমায় বা নিয়তির বিচিত্র লীলায়, এখন আমাদের সমাজের দশান্তর ঘটিয়াছে। এখন সে বিলাস-বিদ্বেষ, সৌখীনতার আবর্ত্তে পড়িয়া নিমজ্জিত হইয়াছে; সে কষ্ট-সহিষ্ণুতা, আলস্য ও শ্রম-বিমুখতার সহিত সংগ্রামে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; সে পর-নিষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থ ভাবের স্থলে বিকট স্বার্থ-পরতার কঠোরপীড়নে আশ্রয়-প্রার্থী আর্ত্তজন কাতরভাবে হাহাকার করিতেছে। এই অধঃপতন ও অধো-গতির কালে, এই দুঃখ ও দুর্গতির শোচনীয় সময়ে, আমাদের মধ্যে আবার একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ হইয়াছিল। আবার এই পর-নিগৃহীত, পরপদ-দলিত, পরাবজ্ঞাত জাতির মধ্যে একটি মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া, সেই পূর্ব্বতন স্বর্গীয় ভাব—সেই মহিমান্বিত আর্য্যসমাজের মহত্তর কার্য্যের অবতারণা করিয়াছিলেন। ভীষণ মহামরুতে সুচ্ছায় বৃক্ষ বা সুপেয়-জলপূর্ণ সরোবর পাইলে, মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত ও আতপ-তাপে ক্লান্ত পান্থ যেরূপ শান্তি লাভ করে, সেই মহাপুরুষকে পাইয়া,

রোগজীর্ণ ও সাংসারিকজ্বালা-যন্ত্রণায় অবসন্ন লোকেও সেইরূপ শান্তি লাভ করিয়াছিল। বীরপুরুষ রণস্থলে বিজয়িনী শক্তির পরিচয় দিয়া, বীরেন্দ্রবর্গের বরণীয় হইতে পারেন; প্রতিভাশালী প্রতিভা দেখাইয়া, সর্ব্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে পারেন; গবেষণা-কুশল পণ্ডিত অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন করিয়া, সহৃদয়দিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিতে পারেন; কিন্তু ভোগাভিলাষ-শূন্যতায়, পরহিতৈষিতায়, সর্ব্বোপরি সর্ব্বার্থত্যাগের মহিমায় তিনি চিরকাল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বসম্মানিত ও সর্ব্বজনের আদরণীয় হইয়া, করুণার পবিত্র মন্দিরে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি পাইবেন। আমরা যাঁহার গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই উক্ত অলোক-সামান্য মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং সেই বিদ্যাসাগরই বাল্যে শ্রমশীলতার সহিত অপরিসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতা, যৌবনে বিলাস-বিদ্বেষের সহিত অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও বার্দ্ধক্যে লোক-হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের সহিত অসামান্য দানশীলতার পরিচয় দিয়া, তেজস্বিতা-ভিমানী ও সভ্যতা-স্পর্দ্ধী ইউরোপীয়ের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই; সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত হয়েন নাই; বা সমৃদ্ধি-সুলভ বিষয়ভোগেও সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠেন নাই। গগন-বিদারী বাদ্যধ্বনিতে তাঁহার জন্ম-গ্রহণ-ঘটনা সূচিত হয় নাই, গায়ক-কুলের কলকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতরবের মধ্যেও তাঁহার উদ্দেশে মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই; দূরবর্ত্তী জনপদবাসীরাও তাঁহার জন্মগ্রহণ জন্য সমবেত হইয়া, বিবিধ উৎসবে উল্লাস প্রকাশ করে নাই। তিনি বাঙ্গালার একটি সামান্য পল্লীতে সঙ্কীর্ণ পর্ণকুটীরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ সাংসারিক বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন ছিলেন। তাঁহার পিতা এক এক দিন অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই অতি

কষ্টে সংসার চালাইতেন। এইরূপ দরিদ্র পিতা এবং দরিদ্রতার মূর্ত্তি-স্বরূপ পিতামহী ও জননী বিদ্যাসাগরের অবলম্বন ছিলেন। পিতা অদূরবর্ত্তী হাট হইতে জিনিসপত্র লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় পিতামহ তাঁহাকে কহিলেন,—"আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" বিদ্যাসাগরের জন্ম-গ্রহণ-সংবাদ এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। এইরূপ দরিদ্রতাময় সংসারে—এইরূপ দরিদ্রতা-ভাবের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনি এই চিরপবিত্র দরিদ্রভাব কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহার জীবন দারিদ্র্য-সহচর ব্রহ্মচারীর ন্যায় পরার্থপরতাময় ছিল। তিনি প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াও, দরিদ্র-ভাবে যে কঠোর ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্রতচর্য্যাই তাঁহাকে অলোক-সামান্য মহাপুরুষের মহিমান্বিত সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছে; তিনি দরিদ্রের জন্য দরিদ্রের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; চিরজীবন দরিদ্রভাবে দরিদ্র পালন করিয়াই, অনন্তপদে বিলীন হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে যে পবিত্র বহ্নিশিখার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রখরদীপ্তি বিশ্বজয়ী রাজাধিরাজকেও হীনপ্রভ করিয়াছে।

বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ মহৎ কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষাও মহত্তর। তিনি প্রতিভাশালী পণ্ডিত অপেক্ষা মহত্তর; যে হেতু, তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর; যে হেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর। যে হেতু তিনি দানশীলতা-প্রকাশের সহিত বিষয়-বাসনা এবং আত্ম-গৌরব-ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন। তাঁহাকে অনেক ভার সহিয়া, অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া, অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি এক দিনের জন্যও

অবসন্ন হয়েন নাই। যখন তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় উপনীত হয়েন, তখন তাঁহার বয়স আট বৎসর। তাঁহার বাসগ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। তখন রেলওয়ে ছিল না —ষ্টিমার ছিল না। তখন পদব্রজে দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া, কলিকাতায় আসিতে হইত। পথ যেরূপ দুর্গম, দস্যু-তস্করের উপদ্রবে সেইরূপ বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। অষ্টমবর্ষীয় বালককে এই দুর্গম ও বিপত্তি-পূর্ণ পথের অধিকাংশ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। রাজ্য-তাড়িত ও নিরতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হুমায়ুন যখন মরুভূ-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র জনপদে স্বীয় তনয়ের জন্মগ্রহণের সংবাদ পাইয়া, অন্য সম্পত্তির অভাবে একটি সামান্য কস্তূরীর খণ্ড বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করেন, তখন তিনি বোধ হয়, কখনও ভাবেন নাই যে, নবপ্রসূত বালক এক সময়ে সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবে। দরিদ্র ঠাকুরদাস যখন অষ্টমবর্ষীয় পুত্রকে সঙ্গে করিয়া, কলিকাতায় তাঁহার প্রতিপালকের গৃহে পদার্পণ করেন, তখন তিনিও বোধ হয়, ভাবেন নাই যে, কালে এই বালক সমগ্র মহৎ ব্যক্তির গৌরব-স্পর্দ্ধা হইয়া উঠিবে। সময়ের পরিবর্ত্তনে বালকদ্বয়ের অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মরুপ্রান্তরবর্ত্তী সামান্য নগরে—দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িতা জননীর রোদন-ধ্বনির মধ্যে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তরুণবয়সে যাঁহাকে নানাকষ্ট সহিয়া দুরূহ কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছিল; সেই আকবর এক সময়ে দিল্লীর রত্ন-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন; এক সময়ে তাঁহারই উদ্দেশে শতসহস্র কণ্ঠ হইতে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বাক্য নির্গত হইয়াছিল। আর সামান্য পর্ণকুটীর যাঁহার আশ্রয়স্থল ছিল, যৎসামান্য আহারীয় যাঁহার রসনাতৃপ্তি ও উদরপূর্ত্তির একমাত্র সম্বল ছিল, যিনি মলিন-বসনে, পথশ্রান্তিতে অবসন্ন-হৃদয়ে এবং নিরতিশয় দীনভাবে এই মহানগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এক সময়ে তিনিই জগজ্জয়ী সম্রাটের

সিংহাসন অপেক্ষাও উচ্চাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। অসামান্য অধ্যবসায়ে, অনন্য-সাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণুতায় বিদ্যাসাগর এইরূপ উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতকলেজে সংস্কৃতবিদ্যার অনুশীলনে তৎ-সমকালে তাঁহার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, স্মৃতি—সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষাগুরু তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও পাঠানুরাগ দেখিয়া, আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন; সতীর্থগণ তাঁহার উদারভাব ও সারল্যময় সদাচারে সন্তুষ্ট থাকিতেন; বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তাঁহার বিদ্যা-পারদর্শিতার জন্য তাহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিতেন। অধ্যয়ন-সময়ে তিনি স্বহস্তে পাক করিতেন; অনেক সময়ে স্বয়ং বাজার করিতে যাইতেন; কনিষ্ঠ সহোদরদিগকে আহার করাইয়া, স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন, এবং বিদ্যালয় হইতে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া, আহারের পর প্রায় সমস্ত রাত্রি প্রগাঢ় অভিনিবেশ-সহকারে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিতেন। এইরূপ আত্মসংযম, এইরূপ নিষ্ঠা, এইরূপ স্বাবলম্বন, এবং এইরূপ সহিষ্ণুতার সহিত তিনি অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই শক্তির প্রসাদে তিনি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষণ অনমনীয় ও অপরাজেয় থাকিতেন। বিদ্যালয় হইতে তিনি যে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, শেষে সেই উপাধিই তাঁহার একমাত্র পরিচয়স্থল হইয়া উঠে। বিদ্যার প্রাণরূপিণী বাণী যেন সেই দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রেরই পরিচয় দিবার জন্য লোকের 'রসনায় লীলা' করিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গবর্ণমেণ্টের চাকরি গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার প্রতিভার সহিত অসামান্য সৎকার্য্যশীলতা পরিস্ফুট হইতে থাকে। বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধন তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য। বিদ্যাসাগর যদি আর কিছু না করিতেন, তাহা হইলেও কেবল এই কার্য্যে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ

দশ আড়া মাত্র ধানে পরিতুষ্ট হইয়া, যে কাব্য প্রণয়ন করেন, সেই কাব্যের প্রসাদেই তিনি বাঙ্গালার কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর আর কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও, তাঁহার অমৃতময়ী-লেখনী-বিনিঃসৃত গদ্য গ্রন্থাবলীর গুণে তিনি চিরকাল বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংসারে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়ে পরিপুষ্টা ও পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যও সেইরূপ সংস্কৃতের উপর নির্ভর করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নতিপথে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের পরিপোষণপক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য ভাষারও যথোচিত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। তরঙ্গিণী গিরিবরের জলোৎসে শক্তিসংগ্রহ করিয়া, তরঙ্গ-রঙ্গে প্রধাবিতা হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃত ভাষার অমৃত-প্রবাহে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও, অন্যান্য ভাষার শব্দ-সম্পত্তি ও ভাবরাশিতে আবেগময়ী হইয়াছে। বিদেশী জাতির সহিত কোন দেশের সংস্রব ঘটিলে, তাহাদের ভাষা ক্রমে সেই দেশের ভাষার সহিত মিলিত হইতে থাকে। এখন ইংরেজী সাহিত্যের অসামান্য প্রভাব। ইংরেজী সাহিত্য এখন পৃথিবীর সমগ্র সভ্য দেশে সাদরে পরিগৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সদ্ভাব-সম্পন্ন, সৌন্দর্য্যময়, শব্দ-সম্পত্তিশালী, বিশাল সাহিত্য কেবল আঙ্গ্‌লো-সাক্ষণদিগের ভাষায় উন্নতি লাভ করে নাই। ব্রিটেনে রোমীয়দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রিটনদিগের ভাষার উপর রোমক সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আঙ্গ্‌লো-সাক্ষণ জাতি ইংলণ্ডে বাস করিলে, ডেন্, নরমান্ প্রভৃতি জাতি উপস্থিত হইয়াছে; ডেন্, নরমান্ প্রভৃতির ভাষা সাক্ষণদিগের ভাষাকে উন্নতির দিকে লইয়া গিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য্যে, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির

সমবায়ে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখন সমগ্র জগতে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। বঙ্গদেশের সহিত বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে, সেই সেই জাতির ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। মুসলমান বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করিলে, অনেক মুসলমানী কথা বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। মুসলমানের অধিকার হইতেই ফার্সী ও উর্দ্দুর সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ ঘটে। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ফার্সী কথাগুলি সাধুভাষার সহিত সংযোজিত হইয়া, মুসলমানের পূর্ব্বতন আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু মুসলমান ভারতের অধিরাজ হইলেও, সাহিত্য-সম্পত্তিতে তাদৃশ সমৃদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা ইতিবৃত্ত-রচনায় যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, ভাবগর্ভ প্রবন্ধমালা বা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে, বোধ হয়, সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলনের দিকেই তাঁহাদের সবিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই, তাঁহারা শিক্ষার সার্থকতা হইল বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং মুসলমানের সাহিত্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমানের পর অন্য এক জাতির সংস্রবে বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগান্তর ঘটিয়াছে। এই জাতি সামান্যভাবে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করেন, সামান্যভাবে ক্রয়-বিক্রয় ক্ষতি-লাভের গণনায় প্রবৃত্ত হয়েন; শেষে আপনাদের বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতা-গৌরবে ভারতের রত্ন-সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠেন। ইঁহাদের প্রদর্শিত যত্নে, ইঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায়, ইঁহাদের অবলম্বিত পরিশুদ্ধ রীতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ইংরেজ যখন বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন বাঙ্গালী আপনাদের আদিম ও অকলঙ্ক কবিত্ব-সম্পত্তিতে পরিতৃপ্ত থাকিত। তখন ফুল্লরার বারমাস্যা গৃহে গৃহে গীত হইত; অন্নদার জরতী-বেশে, বা

মালিনীর প্রতি বিদ্যার তিরস্কারে, লোকে আমোদিত হইত; মনসার ভাসানে বঙ্গের পর্ণকুটীরে লোকারণ্যের আবির্ভাব ঘটিত; কালীকীর্ত্তনের শান্তি-রসাস্পদ উদাত্ত ভাবে দরিদ্র পল্লীবাসীকে অমর-লোকের অপূর্ব্ব শোভা দেখাইয়া দিত। বঙ্গের সর্ব্বস্বান্ত ঘটিলেও, বাঙ্গালী অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইলেও, আজ পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় তাহার অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। এখনও চিরদরিদ্র ব্যক্তি বঙ্গের দরিদ্র কবির বর্ণনায় আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে; বিষয়াসক্ত ভোগী ক্ষণকালের জন্য বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, নিস্পন্দভাবে সেই কবিত্ব-সুধা পান করিতেছে এবং সংসার-বিরাগী উদাসীন সেই অপার্থিব ভাবে বিমোহিত হইয়া, স্বর্গরাজ্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্যের এইরূপ উন্নতি হইলেও গদ্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। ইংরেজের সমাগমের পূর্ব্বে যে গদ্য-গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী হৃদয়-গ্রাহিণী নহে। উহা যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধ-বিরহিত। ইংরেজের সময়ে বাঙ্গালায় গদ্যরচনার উৎকর্ষের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ স্বয়ং বাঙ্গালায় গদ্যরচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে রচনার বিষয়-সন্নিবেশ করিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা ইংরেজের শিক্ষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইংরেজের এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ইংরেজের সমাগমে, মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাম-মোহনের ক্ষমতায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে বৃক্ষের উদ্গম হয়, তাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভায় ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য পদ্যের ন্যায় প্রাচীন নহে। প্রায় এক শতাব্দী হইল বাঙ্গালায় মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের প্রচার হয়। শত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু

সাধারণের মধ্যে উহার তাদৃশ প্রচার নাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে, বাঙ্গালায় রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত্র (১৮০১); গোলোকনাথের হিতোপদেশ (১৮০১ ; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত (১৮০১); রামরাম বসুর লিপিমালা (১৮০২); চণ্ডীচরণ মুন্সী-প্রণীত তোতা-ইতিহাস (১৮০৫) প্রভৃতি প্রচারিত হয়। রামবসু সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু তিনি গ্রন্থরচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালাভাষার চিরন্তন রীতিও তাঁহার অবলম্বনীয় হয় নাই। কথিত আছে, তিনি ফার্সীতে পারদর্শী ছিলেন ; এজন্য স্বকীয় গ্রন্থে পারস্য ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রকাশের পর রামবসুর লিপিমালা প্রকাশিত হয়। লিপিমালায় পত্রছলে নানা-বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। গদ্যরচনায় রামবসুর ক্ষমতা ছিল না। প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের গদ্য লিপিমালায় কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করে নাই। উভয় গ্রন্থের রচনাই বাঙ্গালাভাষার রীতি-বহির্ভূত। উহা যেরূপ প্রাঞ্জলতা-পরিশূন্য, সেইরূপ লালিত্য-হীন।

ইহার পর যে গদ্যগ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা সরলভাবে ও রচনা-রীতিতে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র লিখিয়া আপনার গদ্যরচনা-চাতুরী দেখাইয়াছেন। যে রচনা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রে তাহা অনেকাংশে উন্নতি লাভ করে। উভয় গ্রন্থের লেখকই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন। প্রতাপাদিত্যচরিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র, উভয়ই কেরি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তোতা-ইতিহাস প্রভৃতিতে গদ্য-রচনার উৎকর্ষ লক্ষিত হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রাজা রাম-মোহন রায়ের গদ্য প্রাঞ্জল এবং লালিত্যগুণ-সম্পন্ন নহে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কার "রাজাবলি" এবং "প্রবোধচন্দ্রিকা" রচনা করেন। প্রবোধচন্দ্রিকার

ভাষা দুরুচ্চার্য্য উৎকট সংস্কৃত শব্দ এবং অপভ্রষ্ট গ্রাম্য কথায় পরিপূর্ণ। বিদ্যালঙ্কারের অন্যতর গ্রন্থ রাজাবলিতে কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌দিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। রাজাবলি প্রবোধচন্দ্রিকার চারি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাজাবলির ভাষা অনেকাংশে প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকা প্রকাশের সাত বৎসর পরে বেদান্ত গ্রন্থ (বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা) প্রকাশ করেন। তাঁহার ক্ষমতায় বাঙ্গালা গদ্য অনেকাংশে পরিমার্জ্জিত হয়। কিন্তু উহাও তাদৃশ প্রসাদ-গুণশালী ও ললিত-শব্দাবলীতে শ্রুতিমধুর নাই। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস, জীবনচরিত, ভূগোল, জ্যামিতি প্রভৃতি নানাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম বিদ্যাকল্পদ্রুম। বিদ্যাকল্প-দ্রুমের ভাষা রচনাবৈচিত্র্যের সমাবেশেও শ্রুতি-সুখকর হয় নাই। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের প্রতিভাতেই বাঙ্গালা গদ্য যেরূপ কোমল ও মধুর, সেইরূপ ওজস্বী হইয়া উঠে। বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রাঞ্জলভাবের ও মাধুর্য্যগুণের দৃষ্টান্ত-স্থল।

ভাগীরথী যেমন হিমগিরির সঙ্কীর্ণ কন্দর হইতে নির্গত হইয়া, ক্রমে স্বকীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং বহু জনপদ অতিক্রমপূর্ব্বক শেষে শতমুখী হইয়া, সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনাও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবস্রোত হইতে উৎপন্ন হইয়া, মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম-পূর্ব্বক বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া, শেষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গমলাভে সমর্থ হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গমস্থল যেমন মহাতীর্থ হইয়া, শত শত তীর্থযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিদ্যাসাগর-সঙ্গমও সেইরূপ সাহিত্য-সেবকদিগের মহাতীর্থস্বরূপ হইয়া, তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধভাবে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে। যে রচনা এক সময়ে উৎকট,

দুর্ব্বোধ ও পূর্ব্বাপর-সম্বন্ধশূন্য ছিল, তাহা বিদ্যাসাগরের গুণে সংস্কৃত হয়, এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্ত মহিমার পরিচয় দিতে থাকে। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা সাহিত্যের পিতা না হইলেও স্নেহময়ী মাতার ন্যায় উহার পুষ্টিকর্ত্তা ও সৌন্দর্য্য-বিধাতা। তাঁহার যত্নে গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। দশভুজা দুর্গার প্রতিমায় খড় বাঁশ ও দড়ির উপর সামান্য মাটির কাজ হইয়াছিল। তিনি ঐ মাটি যথাস্থানে বিন্যস্ত করেন, এবং মৃত্তিকাময়ী মূর্ত্তিকে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত ও বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া, দেব-মণ্ডপ শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলেন। এক সময়ে উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে "পুরুষপরীক্ষা" ও "প্রবোধচন্দ্রিকা"র অধ্যাপনা হইত। কিন্তু উৎকট শব্দাবলীর জন্য উহাও তাদৃশ প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে নাই। উহার—".মলয়াচলানিল উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নর্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"—, এইরূপ বিভীষিকাময়ী ভাষায়, বোধ হয়, পাঠার্থীদিগকে শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। বিদ্যাসাগর এই উৎকট ভাবের সংশোধন করেন। তাঁহার মহাভারত ও বেতালপঞ্চবিংশতিতে যেরূপ ওজস্বিতা ও শব্দপ্রয়োগ-বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাঁহার সীতার বনবাসে ও শকুন্তলায় সেইরূপ ললিতপদ-বিন্যাসের সহিত অসামান্য মাধুর্য্য লক্ষিত হয়। সীতার বনবাস ও শকুন্তলা, গদ্যরচনায় তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শনস্থল। তিনি বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রতি গ্রন্থই তাঁহার অসাধারণ রচনাচাতুরী ও শব্দমাধুরীর জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা তদীয় অদ্বিতীয় সম্পত্তি। উহা প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জল-প্রবাহের ন্যায় নিয়তই জীবন-তোষিণী। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই; স্বল্পায়াসে ও সুপ্রণালীক্রমে ভাষা-

শিক্ষারও সদুপায় করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষার বিস্তারে তিনি আজীবন যত্নশীল ছিলেন। এ অংশে বালক, বালিকা, প্রৌঢ়, কেহই তাঁহার নিকটে উপেক্ষণীয় ছিল না। তাঁহার বন্দোবস্তের গুণে এই মহানগরীর বীটন-বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রথমে সুনিয়মে সম্পন্ন হয়, তাঁহার যত্নাতিশয়ে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার প্রস্তাবক্রমে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। বালিকাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থ না থাকাতে, তিনি বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পুস্তকসমূহের প্রচার করেন। সংস্কৃতশিক্ষার্থীরা ব্যাকরণ ও অমরকোষ অভিধান পড়িয়া, কাব্যপাঠে প্রবৃত্ত হইত। এক ব্যাকরণপাঠেই তাহাদের অনেক সময় যাইত। এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় উপক্রমণিকা প্রভৃতির প্রণয়ন ও ঋজুপাঠ প্রভৃতির প্রচার করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। এইরূপে শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার অসামান্য যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কার্য্যে তিনি প্রভূত অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন—জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতীয় পরিচ্ছদ ও জাতীয় ভাবের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষগণের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। সকলেই তাঁহার আদর করিতেন; সকলেই তাঁহার প্রতি সম্মান দেখাইতেন; সকলেই কোনরূপ জটিল বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহার পরামর্শগ্রহণে উদ্যত হইতেন। তিনি এই প্রধান রাজপুরুষগণের নিকটে ধুতি চাদর ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদে যাইতেন না। ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে তিনি আমোদিত হইতেন। স্বয়ং সামান্য বেশে থাকিয়া, তিনি মূল্যবান্ ইংরেজী গ্রন্থগুলিকে বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া, যত্নসহকারে স্বকীয় পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ইংরেজী রীতির অনুবর্ত্তী হয়েন নাই; ইংরেজী ভাবে পরিচালিত হইয়া উঠেন

নাই ; ইংরেজী প্রথার অনুকরণে আপনাদের জাতীয় প্রথা বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার আবাস-গৃহের বৈঠকখানায় ফরাসের পরিবর্ত্তে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি ছিল বটে, কিন্তু উহা তাঁহার ইংরেজী ভাবানুরাগের পরিচয় না দিয়া, তদীয় অসামান্য শ্রমশীলতা ও কার্য্যক্ষমতারই পরিচয় দিত। এখন আমাদের এমনই বিলাসিতা ও শ্রমবিরাগ ঘটিয়াছে যে, আমরা প্রায় সকল সময়েই ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া, আপনাদিগকে লম্বোদরে পরিণত করিতে যত্নশীল হই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ বিলাসী ও শ্রমবিমুখ ছিলেন না। তিনি সমভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া সর্ব্বদা কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতেন। এই জন্যই বলিতেছি যে, চেয়ার প্রভৃতি তাঁহার শ্রমশীলতা ও কার্য্যক্ষমতারই পরিচয়-স্থল। ফলতঃ তিনি জাতীয় ভাবের মর্য্যাদা-রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা হইলে বা রাজদ্বারে কিয়দংশে প্রতিপত্তি ঘটিলে, এখন আমাদের মধ্যে অনেকে জাতীয়ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবেরই পরিপোষক হইয়া উঠেন। তাঁহারা আপনাদের অহঙ্কারে আপনারাই স্ফীত হইয়া, আপনাদের কার্য্যে আপনাদিগকেই গৌরবান্বিত মনে করিয়া, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হিতৈষিতা থাকিতে পারে, ভূয়োদর্শন থাকিতে পারে, কার্য্যপটুতা থাকিতে পারে ; কিন্তু একমাত্র বৈষম্যবুদ্ধির বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে তৎসমুদায়ই বিজাতীয় ভাবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাদের—এই পরমুখপ্রেক্ষী, পরানুগ্রহপ্রার্থী, শিক্ষিত পুরুষগণেরও শিক্ষার স্থল। তিনি ধুতি চাদর পরিয়া, পূর্ব্বতন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব, বীডন সাহেব প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কথিত আছে,—বীডন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধুতি চাদর দেখিয়া, সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন। একদা গ্রীষ্মকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখেন যে, বীডন সাহেব গ্রীষ্মাতিশয্যে ঢিলে পাজামা ও

পাতলা কামিজ পরিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এখন ইচ্ছা হয়, তোমাদের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"তাহাই কেন করুন না।" উত্তর শুনিয়া লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর বলিলেন,—"ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদের দেশাচার-বিরুদ্ধ—দেশাচার-বিরুদ্ধ কাজ কেমন করিয়া করি।" এবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তেজস্বিতার সহিত অপূর্ব্ব অভিমানের আবির্ভাব হইল। স্বদেশীয় ভাবের প্রাধান্য-রক্ষার জন্য পুরুষসিংহ, লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে অম্লানবদনে কহিলেন,—"আপনাদের বেলা দেশাচার প্রবল—আর আমাদের বেলা কিছুই নয়; আপনারা এরূপ মনে করেন কেন?" * জাতীয়গৌরব-রক্ষার্থী মহাপুরুষ বঙ্গের শাসনকর্ত্তার সমক্ষে এইরূপ স্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপ স্বাধীনভাবের বলেই তাঁহার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ, তাঁহার সম্মান অব্যাহত, তাঁহার প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকিত। পাশ্চাত্য ভাবের প্রবাহে যে দেশ প্লাবিত হইয়াছে—পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অপকৃষ্ট ছায়া যে দেশের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে—পরানুগত্যে, পর-পরিতুষ্টির আগ্রহে যে দেশ ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই দেশের একজন ব্রাহ্মণ যেরূপ স্বাধীনভাবে, যেরূপ তেজস্বিতা-সহকারে, প্রধান রাজপুরুষগণেরও সমক্ষে জাতীয় ভাবের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীন ভাব ও তেজস্বিতার কথা, চিরকাল এই শোচনীয়ভাবাপন্ন ভূখণ্ডের শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে উপদেশ দিবে।

* এই গল্পটি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একাল" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, রাজনারায়ণ বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াই ঐ গল্পটি লিখিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহের আন্দোলনে তাঁহার এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। রাজকীয় বিধির বলে বহুবিবাহরোধের চেষ্টা করাতেও অনেকের বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য দয়াই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। করুণার মোহিনী মাধুরীতে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকিত। কাহারও নিদারুণ দুঃখ দেখিলে, বা কাহারও অসহনীয় কষ্টের কথা শুনিলে, তিনি যাতনায় অধীর হইতেন। তখন তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি উজ্জ্বলতর হইত, এবং তাহা হইতে মুক্তাফল-সদৃশ অশ্রুবিন্দু নির্গত হইয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করিত। কিন্তু অশ্রু-প্রবাহের সহিত তাঁহার হৃদয়-নিহিত যাতনার অবসান হইত না। তিনি যতক্ষণ দুঃখীর দুঃখমোচন করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ স্থির থাকিতে পারিতেন না। এইরূপ দয়াশীল পুরুষের কোমল হৃদয় অনাথা বাল-বিধবা ও পতিবিচ্ছেদ-বিধুরা কুলকামিনীদিগের দুর্দ্দশায় সহজেই বিচলিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অভাগিনীদের দুঃখমোচনে বদ্ধ-পরিকর হইলেও, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ বিষয়ে শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে ভাবে শাস্ত্র বুঝিয়াছেন, সেই ভাবেই সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সরলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিধবাবিবাহ-বিষয়ক ও বহুবিবাহসম্বন্ধীয় পুস্তক, তদীয় অসামান্য গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয়-স্থল; এই দুই গ্রন্থ লিখিবার সময়ে তাঁহাকে বিস্তর হস্তলিখিত পুঁথির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে হইয়াছিল। বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থের রচনাসময়ে তিনি যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সংস্কৃত পুঁথির পাঠোদ্ধার ও উহার অর্থসঙ্গতি করিতে, তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে বসিয়া, শাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করিতেন, এবং উহার অর্থ লিখিতেন। কথিত আছে, একদিন অনেক ভাবিয়াও কোন বচনের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইল। অগত্যা লেখায় নিরস্ত হইয়া, ভাবিতে ভাবিতে বাসগৃহে চলিলেন। কিয়দ্দূর গেলে, সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণ-সময়ে, পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে, যেরূপ প্রফুল্ল হয়, তিনিও পূর্ব্বোক্ত বচনের অর্থপরিগ্রহ করিয়া, সেইরূপ প্রফুল্ল হইলেন। আর তাঁহার বাসায় যাওয়া হইল না। তিনি পুনর্ব্বার প্রফুল্লভাবে কলেজের পুস্তকালয়ে যাইয়া লিখিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু-বিধবার দুঃখদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিসলিল প্রক্ষেপের জন্য এইরূপ অধ্যবসায়ের সহিত শাস্ত্র-সিন্ধু-মন্থনে উদ্যত হইয়া-ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার আয় সামান্য ছিল। তথাপি তিনি এজন্য অবিকারচিত্তে দুর্ব্বহ ঋণভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল এবং তাঁহার মত সমাজের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত না হইলেও, কেহই তাঁহার অধ্যবসায়, দানশীলতা ও স্বার্থত্যাগের প্রশংসাবাদে বিমুখ হইবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি পরমারাধ্য পিতা ও স্নেহময়ী মাতার অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতাপিতা তাঁহার নিকটে প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ ছিলেন। পিতার অমতে বা মাতার বিনানুমতিতে তিনি কখনও কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। মাতাপিতার প্রতি তাঁহার এইরূপ অসাধারণ ভক্তি ছিল। কথিত আছে, কোনও বালিকার বৈধব্য দেখিয়া, তাঁহার মাতা সজলনয়নে তাঁহাকে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, বিচার করিতে বলেন। পিতা নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনিও এ বিষয়ে অনুমোদন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিধবাবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, শাস্ত্র কখনও উহার বিরোধী হইবে

না। কিন্তু চিরন্তন অনুশাসন ও চিরপ্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে, পাছে ভক্তিভাজন জনকজননী মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন, এই জন্য তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; শেষে মাতাপিতার সম্মতিদর্শনে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হয়। তিনি বিধবার বৈধব্যদুঃখ দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। তিনি এই প্রসঙ্গে একদিন দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছিলেন,—"মাতাপিতার অনুমতি না পাইলে, আমি কখনও এই কার্য্যে উদ্যত হইতাম না; অন্ততঃ তাঁহারা যতদিন জীবিত থাকিতেন, ততদিন এ বিষয়ে নিরস্ত থাকিতাম।" পরমাত্মনিষ্ঠ সাধক যেমন আপনার সাধনার সিদ্ধিলাভের জন্য, তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবতার অনুমতি ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, তিনিও সেইরূপ প্রত্যেক বিষয়ে পরমদেবতাস্বরূপ মাতাপিতার সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকিতেন। এখন আমাদের সমাজে যাঁহাদের শিক্ষাভিমান জন্মিয়াছে, প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া যাঁহারা জলদগম্ভীর স্বরে "সংস্কার, সংস্কার" বলিয়া চারি দিক্ কম্পিত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে জনকজননীর মুখের দিকে দৃক্‌পাত করিতে দেখা যায় না। কঠোর কর্ত্তব্যপালনের দোহাই দিয়া, তাঁহারা অবলীলাক্রমে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে মাতাপিতার বুকে শেল হানিয়া থাকেন। পিতা একান্তে বসিয়া নয়নজলে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতেছেন, মাতা দুঃসহ দুঃখে অভিভূতা হইয়াছেন, নিদারুণ শোকাগ্নি তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রসারিত হইতেছে, শিক্ষিতাভিমানী পুত্র কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যপালনে কিছুতেই নিরস্ত নহেন। পুত্রের এই কঠোর কর্ত্তব্যপালনপ্রতিজ্ঞায় এখন অনেকস্থলে পিতা শোকশল্যের অভিঘাতে মর্ম্মাহত হইতেছেন, মাতা প্রীতির অবলম্ব, স্নেহের পুত্তলী তনয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতেছেন। কিন্তু মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহোদয় পিতৃভক্তিতে পবিত্রতর—মাতৃসেবায় মহৎ হইতে মহত্তর ছিলেন।

তিনি অবলীলাক্রমে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু সুখপ্রদ—যাহা কিছু মনোমদ—যাহা কিছু প্রীতিপ্রদ, তৎসমুদয়েই উপেক্ষা দেখাইতে পারিতেন; রাজাধিরাজের নানারত্নসমাকীর্ণ দেব-বাঞ্ছনীয় সিংহাসনেও পদাঘাত করিতে পারিতেন; কিন্তু মাতাপিতাকে দুঃখাভিভূত করিতে পারিতেন না। মাতার নয়নজলের সমক্ষে তিনি সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। একবার তিনি আপনার ও পোষ্যবর্গের জীবনরক্ষার অদ্বিতীয় অবলম্বস্বরূপ চাকরি পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি মাতাকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিতে সম্মত হয়েন নাই। বহুব্যয়ে তিনি মাতাপিতার উৎকৃষ্ট চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহাত্যয় ঘটিলে, অনেক সময়ে তিনি সেই প্রতিকৃতির সম্মুখে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন; পরমভক্ত পুরুষসিংহ, এইরূপে সেই পরমগুরু জনক, সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীর অনুপম স্নেহ ও মহীয়সী প্রীতির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, এবং পবিত্র শোকাশ্রুতে তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধন করিতেন। যাঁহারা এখন শিক্ষাভিমানে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন, মহাপুরুষের মাতাপিতার প্রতি এইরূপ ভক্তি তাঁহাদের উপেক্ষার বিষয় নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রত্যেক বিষয়ে মাতাপিতার প্রতি যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়া চলিতেন, সেইরূপ সামাজিক প্রথার অনুসারে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে শাস্ত্রীয় বিধির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। সমাজহিতৈষী সংস্কারকগণ যখন সহবাস-সম্মতির বিধানে আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করেন নাই। এ সকল বিষয়ে তিনি শাস্ত্রের অর্থ যেরূপ বুঝিতেন, তদনুসারেই চলিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দীন দুঃখী ও অনাথদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি দয়ার সাগর; দান তাঁহার চিরন্তন ধর্ম্ম ও চিরপবিত্র কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার গ্রন্থাবলী কৃতী পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে

প্রচুর অর্থ আনিয়া দিত ; তিনি উহার অধিকাংশ পর-পোষণে ও পরদুঃখ-মোচনে ব্যয় করিতেন। গরীব দুঃখীরা কেবল প্রত্যহ তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দান গ্রহণ করিত না। অনেকে তাঁহার নিকটে মাসে মাসে আপনাদের ভরণপোষণের জন্য অর্থ পাইত। তিনি প্রাত্যহিক, মাসিক, নৈমিত্তিক দানে হৃদয়-নিহিত দয়ার তৃপ্তিসাধন করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকটে জাতিভেদ ছিল না, শ্রেণীভেদ ছিল না, সম্প্রদায়-ভেদ ছিল না। তিনি সকলেরই স্নেহময়ী ধাত্রী, প্রীতিভাজন পরিজন এবং বিশ্বপ্রেমময়ী জননীর তুল্য ছিলেন। যেখানে উপায়হীন রোগার্ত্ত ব্যক্তি দুরন্ত রোগের দুঃসহ যাতনায় কাতরতা প্রকাশ করিত, সেই খানেই তিনি তাহার রোগ-শান্তির জন্য অগ্রসর হইতেন ; যেখানে নিঃস্ব নিঃসম্বল লোকে গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিত, এবং এই রোগশোকময় সংসারে শোচনীয় দারিদ্র্যভাবে আপনাদের অনন্ত যাতনার পরিচয় দিত, সেইখানেই তিনি তাহাদের দুঃখমোচনে উদ্যত হইতেন; যেখানে অভাগিনী অনাথা শোকের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ নির্জ্জন পর্ণকুটীরে নীরবে বসিয়া থাকিত এবং হৃদয়ের প্রচণ্ড হুতাশন নিবাইবার জন্যই যেন নিরন্তর নয়নসলিলে বক্ষোদেশ ভাসাইয়া দিত, সেইখানেই তিনি তাহার কষ্ট দূর করিবার জন্য যত্নের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ হইতে অরণ্যবিহারী অসভ্য সাঁওতাল পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপে তাঁহার অসীম করুণায় শান্তি লাভ করিত। যে পাপপঙ্কে ডুবিয়া স্বজনভ্রষ্ট ও সমাজচ্যুত হইয়াছে,—সমাজের অত্যাচারেই হউক, পরের প্রলোভনেই হউক, আত্মসংযমের অভাবেই হউক, যে সহায়শূন্য হইয়া দুস্তর দুঃখসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তিনি তাহার প্রতিও করুণাপ্রকাশে সঙ্কুচিত হইতেন না। লোকে উদাসীন-ভাবে যাহার কষ্ট চাহিয়া দেখিয়াছে, যাহার কাতরতায় নিমীলিত-নয়নে নিশ্চেষ্টভাবের পরিচয় দিয়াছে, যাহার মলিনভাব দেখিয়া, ঘৃণায় মুখ বিকৃত ও নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, অন্য দিক্ দিয়া

চলিয়া গিয়াছে, তিনি পবিত্রভাবে তাহাদিগকে পবিত্র পদার্থের ন্যায় তুলিয়া, শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপিত করিতেন। সম্রাট্ শাহ আলম যখন সিংহাসন হইতে অপসারিত হয়েন এবং বৃদ্ধ অন্ধ ও অধঃপতনের চরম সীমায় পতিত হইয়া, পরপ্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তখন তিনি করুণরসপূর্ণ কবিতায় এই বলিয়া আপনার চিত্তবিনোদন করিতেন,—"দুর্দ্দশার প্রবল ঝটিকা আমাকে পরাভূত করিয়াছে। উহা আমার সমস্ত গৌরব অনন্ত বায়ুরাশির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এবং আমার রত্নসিংহাসনও দূরে ফেলিয়া দিয়াছে। গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেও এখন আমি দরিদ্রভাবে পবিত্র ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের দয়ায় উজ্জ্বল হইয়া, এই কষ্টময়, এই অন্ধকারময় স্থান হইতে উঠিতে পারিব।" দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরও ঐ সকল নিরুপায় দুঃখীদিগকে দরিদ্রভাবে পবিত্র বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। কথিত আছে, একদা তিনি প্রাতঃকালে ভ্রমণ করিতে করিতে এই নগরের প্রান্তভাগ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গিয়াছেন, সহসা দেখিলেন, একটি বৃদ্ধা অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে; দেখিয়াই তিনি ঐ মললিপ্ত বৃদ্ধাকে পরম যত্নে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন, এবং তাহার যথোচিত চিকিৎসা করাইলেন। দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার যত্নে আরোগ্য লাভ করিল। যত দিন সে জীবিত ছিল, ততদিন তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিমাসে অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিতেন। *

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, তাঁহার অসামান্য দয়াসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি "দৈনিক" পত্রে প্রকাশ করেন :—

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কর্ম্মচারীকে বলিলেন,—"দেখ,

* এইরূপ গল্পগুলি সঞ্জীবনী, ইণ্ডিয়ান নেশন, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

কলুটোলার অমুক গলির অমুক নম্বর বাড়ীতে এই নামে এক জন মাদ্রাজবাসী আছেন। জানিয়াছি, তিনি অর্থাভাবে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। অতএব তুমি তথায় গিয়া সবিশেষ সংবাদ লইয়া আইস।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রথমে গৃহস্বামীর দেখা পাইলেন। তাঁহার নিকটে উক্ত মাদ্রাজবাসীর নামোল্লেখ করাতে, তিনি বলিলেন,—“হাঁ! আমার এই বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহে তিনি সপরিবারে বাস করেন। আমি তাঁহার নিকটে ছয় মাসের ভাড়া ৩০৲ টাকা পাইব। তিনি উহা দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে ভাড়া পরিশোধ করিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছি। কিন্তু কি করি, তিনি অর্থাভাব প্রযুক্ত আজ দুই তিন দিন সপরিবারে অনাহারে রহিয়াছেন।” কর্ম্মচারী গৃহস্বামীর এই কথা শুনিয়া, উক্ত মাদ্রাজবাসীর নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটি সঙ্কীর্ণগৃহে পাঁচটি কন্যা ও দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র লইয়া সামান্য দরমার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। পুত্রকন্যাগণ রুগ্ণ ও অনাহারে শীর্ণ। কর্ম্মচারী এই শোচনীয়-দশাগ্রস্ত মাদ্রাজবাসীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কহিলেন,—“আমি এই কলিকাতা সহরে অনেক বড়লোকের নিকট আমার কষ্ট জানাইয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমার দুরবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া একটি কপর্দ্দক দিয়াও আমার সাহায্য করেন নাই। অবশেষে একটি বাবুর নিকটে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা না দিয়া, একখানি পোষ্ট-কার্ডে পত্র লিখিয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন—‘এই সহরে এক পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন। আমি তাঁহারই নামে তোমার দুরবস্থার বিষয় লিখিয়া দিলাম। পত্রখানি ডাকঘরে দিয়া আইস।’ আমি তদনুসারে উক্ত পত্র ডাকঘরে দিয়াছি। এখন, আমার অদৃষ্ট।” কর্ম্মচারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে এই সকল কথা জানাইলেন। শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিরল ধারায় অশ্রুপাত

করিতে করিতে, ঐ কর্ম্মচারী মহাশয়ের হস্তে মাদ্রাজবাসীর বাড়ী-ভাড়া দেনা ৩০৲ টাকা, খোরাকী ১০৲ টাকা এবং তাঁহাদের জন্য নয়খানি কাপড় দিয়া বলিলেন,—"যদি তাহারা বাড়ী যায়, তাহা হইলে, কত হইলে চলিতে পারে, জানিয়া আসিবে। আর এখানে থাকিলে, আমি প্রতিমাসে ১৫৲ টাকা দিব।" কর্ম্মচারী যথাস্থানে উপনীত হইয়া, উক্ত মাদ্রাজবাসীকে টাকা ও কাপড় দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা জানাইলেন। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের অসীম দয়ায় দুঃখী মাদ্রাজবাসী স্ত্রীপুত্রের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন,—"এক শত টাকা হইলে, আমরা সকলে স্বদেশে যাইতে পারি।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মচারীর হস্তে উক্ত টাকা দেন। কর্ম্মচারীও তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে রাখিয়া আইসেন।

বিদ্যাসাগর এইরূপ দয়ার সাগর ছিলেন। তাঁহার অপার করুণা এক সময়ে এইরূপেই দীন-হীনদিগের দুঃখ-সন্তপ্ত হৃদয় শান্তি সলিলে শীতল করিয়াছিল। যাহাদের কাতরতায় কেহই কাতরভাব প্রকাশ করে নাই, যাহাদের কষ্টে কাহারও হৃদয়ে সমবেদনার আবির্ভাব দেখা যায় নাই, যাহাদের উদ্ধারে কাহারও হস্ত প্রসারিত হয় নাই, তিনি এইরূপেই তাহাদিগকে অসহনীয় যাতনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থ কেবল দরিদ্রপালনের জন্যই ব্যয়িত হইত। এই কার্য্যে তাঁহার আড়ম্বর ছিল না। সংবাদপত্রের দিগন্তব্যাপী প্রশংসাধ্বনির প্রত্যাশায় বা রাজকীয় গেজেটে ধন্যবাদপ্রাপ্তির কামনায়, তিনি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন না। তাঁহার কার্য্য নীরবে সম্পন্ন হইত। ধনী পূর্ব্বসঞ্চিত ধনরাশির মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অর্থ দান করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার দান, এই দানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যিনি বিলাসসুখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, দুঃখদারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া, যিনি শেষে প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি আত্মভোগে

উপেক্ষা দেখাইয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপরের প্রশংসা বা নিন্দা তুচ্ছ ভাবিয়া, কেবল যথার্থ কৃপাপাত্রদিগের জন্য যে ব্রত পালন করিতেন, সে ব্রত চিরপবিত্র, চিরন্তন ধর্ম্মের মহিমায় মহিমান্বিত, চিরস্থায়ী গৌরবে গৌরবযুক্ত। বঙ্গের মহাকবি এই চিরপবিত্র ব্রতের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া, এক দিন গম্ভীরস্বরে গাইয়াছিলেন,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি। সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু।"

সমগ্র ভারতও একদিন বিমুগ্ধ হইয়া গাইবে,—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি।"

ফলতঃ নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারসাধনে—নিঃস্বার্থভাবে পরপ্রয়োজনের জন্য উপার্জ্জিত অর্থরাশির দানে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এখন সেই দানবীর চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। কোমলতাময়ী করুণা এখন আশ্রয়ের অভাবে দুর্দ্দশাপন্ন। দুঃখদারিদ্র্যময় জনপদ এখন অধিকতর দারিদ্র্যভারে নিপীড়িত। নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ও নিরন্ন জীবগণ এখন কাতরকণ্ঠে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে যেন এই হতভাগ্য দেশের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। মরুভূ-বাহিনী স্নিগ্ধসলিলরেখা চিরবিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শান্তিবিধায়িনী স্নেহময়ী জননী চিরকালের জন্য অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। কিন্তু যে সলিলের স্নিগ্ধতায় তাপদগ্ধ লোকে শান্তিলাভ করিয়াছিল, যে জননীর করুণায় দরিদ্র সন্তানগণ দারিদ্র্য-যাতনা ভুলিয়া গিয়াছিল, তাঁহার অপার্থিব পবিত্র ভাব চিরকাল এই অনন্তযাতনাগ্রস্ত জাতির গৌরবের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ দয়াশীল, সেইরূপ তেজস্বী ও মহানুভাব ছিলেন। দয়ায় তাঁহার হৃদয় যেরূপ কোমল ছিল, তেজস্বিতা ও মহানুভাবতায় তাঁহার হৃদয় সেইরূপ অটল হইয়া উঠিয়াছিল। চিরদরিদ্র অনাথের নিকটে তিনি যেরূপ স্নিগ্ধ-সুধাকরের ন্যায় প্রশান্ত ভাব প্রকাশ করিতেন, ধনগর্ব্বিত বা ক্ষমতাগর্ব্বিত ব্যক্তির নিকটে তিনি সেইরূপ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় অপূর্ব্ব তেজোমহিমার পরিচয় দিতেন। অভিমান-সহকৃত তেজস্বিতা তাঁহাকে সর্ব্বদা উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিত। শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের সহিত অনৈক্য হওয়াতে, তিনি অবলীলাক্রমে পাঁচ শত টাকা বেতনের চাকরি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আত্মীয়বর্গের পরামর্শ তাঁহার গ্রাহ্য হয় নাই, লোকের কথায় তাঁহার মতপরিবর্ত্তন ঘটে নাই, বা ভবিষ্যতের ভাবনায় তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে নাই। লোকে তখন বলিয়াছিল, ব্রাহ্মণ এবার নিজের অহম্মুখতায় নিজেই মারা পড়িল। আত্মীয়গণ তখন ভাবিয়াছিলেন, এবার বিদ্যাসাগরের অন্নাভাব ঘটিল। কিন্তু অভিমানসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি পরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরের মনস্তুষ্টির জন্য আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেন নাই; তিনি পরের কার্য্যসম্পাদনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন নাই; তিনি পরের আদেশপালনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পরের অনুচিত আদেশানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইয়া আত্মাভিমানের মর্য্যাদা নাশ করেন নাই। তাঁহার হৃদয় এইরূপ অটল ও এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ছিল। বহু অনুরোধে, বহু অনুনয়েও তাঁহার অভিমান অন্তর্হিত, তেজস্বিতা বিচলিত, বা কর্ত্তব্যবুদ্ধি অবনত হইত না। মিবারের রাজপুতগণ অনেকবার আপনাদের ভূ-সম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছেন; অনেকবার

অনেক বিষয়ে স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন ; তথাপি তাঁহারা তেজস্বিতা বা অভিমানে জলাঞ্জলি দেন নাই। মহাত্মা টড্ এই অসামান্য গুণদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, তেজস্বিগণের বরণীয় প্রাচীন গ্রীকদিগের সহিত মিবারের রাজপুতদিগের তুলনা করিয়াছেন। বঙ্গদেশের জন্য যদি এক জন টডের আবির্ভাব হয়, এক জন টড্ যদি বাঙ্গালীর সুকীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তির বর্ণনায় ব্যাপৃত হয়েন, তাহা হইলে তিনি এই অধঃপতিত ভূখণ্ডে এই চিরাবনত জাতির মধ্যে মহাত্মা বিদ্যাসাগরের এমন প্রভাব দেখিতে পাইবেন, যাঁহার অচিন্তনীয় মহিমায় তাঁহার অপরিসীম বিস্ময়ের আবির্ভাব হইবে ; তিনি সেই মহাপুরুষকে গৌরবান্বিত গ্রীকদিগের পার্শ্বে বসাইয়া, মুক্তকণ্ঠে ও ভক্তিরসার্দ্রহৃদয়ে তদীয় স্তুতিগান করিবেন।

এইরূপ তেজস্বী, এইরূপ অভিমানসম্পন্ন বিদ্যাসাগর জনসাধারণের সমক্ষে কখনও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া, হীনতা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার তেজস্বিতা যেরূপ অতুল্য, তাঁহার মহত্ত্ব সেইরূপ অপরিমেয় ছিল। দরিদ্র প্রচুর অর্থের অধিকারী হইলে আত্মগর্ব্বে অধীর হইয়া, আত্মগৌরবের বিস্তারে উদ্যত হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশস্ত হৃদয় এরূপ হীনভাবে কলুষিত ছিল না। যখন তাঁহার প্রভূত-পরিমাণে অর্থাগম হয়, সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হয়, দিগন্তব্যাপিনী মহীয়সী কীর্ত্তির কথা লোকের মুখে মুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে, তখনও তিনি আপনাকে সামান্য দরিদ্র বলিয়াই পরিচিত করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ, সমাজের ধনসম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, সর্ব্বদা যাঁহার সম্মান করিতেন, যাঁহাকে দেখিলে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইতেন, অনেক সময়ে তিনিই সামান্য মুদীর দোকানে বসিয়া, মুদীর সহিত আলাপ করিতেন, এবং দীন-দুঃখীদিগকে আত্মীয় স্বজন বলিয়া আপনার কাছে

বসাইতেন। একদা তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত কোনও বাগান-বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক জন দ্বারবান্ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। এরূপ স্থলে অনেকে হয় ত সামান্য দ্বারবানের দিকে দৃক্‌পাত করেন না। কিন্তু দয়ার সাগর, পত্রবাহককে পরিশ্রান্ত ও প্রখর আতপতাপে অবসন্ন দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পত্রবাহককে শ্রান্তিবিনোদনের জন্য সেই গৃহে বসাইলেন। তদীয় বন্ধুগণ ইহাতে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ বিরক্তিতেও তাঁহার হৃদয়ে অনুদার ভাব বা অহঙ্কারের আবির্ভাব হইল না। একদা তিনি উপস্থিত প্রবন্ধলেখককে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন— "আমি এক দিন ইডেন সাহেবের (ইডেন সাহেব তখন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি বা অন্য কোনও উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন) সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম। এমন সময়ে অন্য এক ব্যক্তি সাহেবের দর্শনার্থী হইয়া, আপনার নাম লিখিয়া পাঠাইলেন। সাহেব চাপরাসীকে বলিলেন—"বাবুকে বল, এখন ফুরসৎ নাই।" ইডেন সাহেবের কথা শুনিয়া, আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখনই সাহেবকে বলিলাম, "আপনি আমার সহিত বসিয়া, বাজে কথায় সময়ক্ষেপ করিতেছেন, ইহাতে আপনার ফুরসুৎ আছে। আর এ ব্যক্তি অবশ্য কোনও প্রয়োজনের অনুরোধে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে আপনার ফুরসৎ নাই! আমি সামান্য গরীব মানুষ; পাল্কীভাড়া করিয়া আসিয়াছি। এ ব্যক্তি যদি গরীব হয়, তাহা হইলে বেচারীর গাড়ীভাড়া দণ্ড হইবে; আর এক দিন আসিলে গাড়ীভাড়া দিতে হইবে।" ইডেন সাহেব তখন ঈষৎ হাসিয়া দর্শনার্থী ভদ্রলোকটিকে আসিতে বলিলেন।" মহাপুরুষের এইরূপ উদারতা, এইরূপ সমদর্শিতা এবং

এইরূপ অহঙ্কারশূন্যতা ছিল। কথিত আছে, একদা একটি ভদ্রসন্তান তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন, "বড় দায়গ্রস্ত হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। দশ হাজার টাকা না হইলে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমি উক্ত টাকা পরে ফিরাইয়া দিব।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তখন বেশী টাকা ছিল না। তথাপি তিনি ভদ্রসন্তানের কাতরতাদর্শনে ব্যথিত হইয়া অন্য স্থান হইতে টাকা আনিয়া দিয়া কহিলেন, "এই টাকা অন্যের নিকট হইতে আনিয়া দিলাম, তোমার সুবিধামত দিয়া যাইও।" ভদ্রলোকটি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই টাকার জন্য তাঁহার নিকটে লোক পাঠাইলে, তিনি কহিলেন—"আমি দান গ্রহণ করিয়াছি। টাকা যে ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকটা আমাকে ঠকাইল, দেখিতেছি।" আর তিনি টাকার জন্য তাঁহার নিকটে লোক পাঠান নাই; আপনিও তাঁহার নিকটে কখনও টাকা চাহেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা আছে। এই সকল মহত্ত্বকাহিনী মহাপুরুষের লোকোত্তর চরিত স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকশিক্ষার জন্য যথোচিত পরিশ্রমস্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারে ও শিক্ষার গৌরববিস্তারে তাঁহার কখনও অমনোযোগ বা ঔদাস্য দেখা যায় নাই। লোকে যাহাতে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম হয়, তৎপ্রতি তাঁহার সাতিশয় যত্ন ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার উন্নতির জন্য এক সময়ে হাজার টাকা দান করিতেও কাতর হয়েন নাই। সংস্কৃতের ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার

এইরূপ অনুরাগ ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার আলোচনার জন্য যত্ন করিয়াছেন এবং সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ভাষানুশীলনেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ অংশে মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ তাঁহার অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করিয়া, উহার উন্নতির জন্য যত্ন, পরিশ্রম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের একশেষ দেখাইয়াছেন। স্বয়ং রোগশয্যায় থাকিয়াও, বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বহু যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, বিদ্যালয়ের জন্য যে প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা রাজকীয় প্রেসিডেন্সী কলেজের সুবিস্তৃত অট্টালিকারও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে। বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার এমনই যত্ন ছিল যে, পূর্ব্বে যে বাড়ীতে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত, সেই বাড়ী যখন বিক্রীত হইয়া যায়, তখন নিজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ঐ স্থানে ও উহার সন্নিকটবর্ত্তী ভূমিতে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে এই নগরের কতিপয় স্থানে মেট্রোপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের কয়েকটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। তিনি সমান যত্নের সহিত সকল বিদ্যালয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার যত্নাতিশয্যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীগুণে, মেট্রোপলিটনের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, তাঁহাকে শতগুণে আহ্লাদিত করিয়াছে। স্বহস্তরোপিত ও যত্নসহকারে বর্দ্ধিত বৃক্ষ সুস্বাদু ফল ভারে অবনত হইলে লোকের যেরূপ আহ্লাদের সঞ্চার হয়, তিনিও সেইরূপ মেট্রোপলিটনের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কি কারণে এরূপ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছেন, কি কারণে এরূপ অতুলনীয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়া, সকলের নিকটে "হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি" পাইতেছেন? মণ্ডলাধিপতি

সম্রাট্ অসামান্য ক্ষমতা ও অপরিমিত অর্থের বলে যে সম্মান লাভ করিতে পারেন না, একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান কি গুণে সেই সম্মানের পাত্র হইয়াছেন? ইহার একমাত্র কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মস্তিষ্কের অসাধারণ ক্ষমতার সহিত হৃদয়ের অতুল্য শক্তির সামঞ্জস্য। যিনি হৃদয়ের শক্তিতে উপেক্ষা করিয়া, মস্তিষ্কের শক্তিতে মহৎ হইতে চাহেন, তিনি মহত্ত্বের অধিকারী হইতে পারেন না। উদারতা, হিতৈষিতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণসমূহ তাঁহা হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করে। তিনি কেবল আত্মস্বার্থে পরিতুষ্ট থাকেন, পরার্থে তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। গৃধ্রকুল যেমন সুদূরগগনতলে উড্ডীয়মান হইলেও ভূতলস্থ গলিত শবের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখে, তিনিও সেইরূপ বুদ্ধিবৈভবে উন্নত হইলেও হৃদয়ের শক্তির অভাবে নিকৃষ্টতর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া, ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবনত হইতে থাকেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সহিত হৃদয়ের অপূর্ব্ব শক্তি ছিল। তিনি এক দিকে জ্ঞানগৌরবে ও বুদ্ধিবৈভবে যেরূপ মহিমান্বিত, অপর দিকে হৃদয়ের মহৎ গুণে সেইরূপ গৌরবান্বিত। তাঁহার অভিমান ও তেজস্বিতা যেরূপ অতুল্য, তাঁহার কোমলতা ও দয়াশীলতাও সেইরূপ অসামান্য। আত্মাভিমান, আত্মাদর ও আত্মনির্ভরের বলে তিনি কোনও বিষয়ে পরের নিকটে অবনত বা কোন বিষয়ে পরমুখপ্রেক্ষী হইতেন না। ইহা তাঁহার হৃদয়ের অসামান্য শক্তির নিদর্শনস্বরূপ। লোকের শিক্ষাবিধান হেতু তিনি স্নেহময় পিতা, এবং লোকের পালন ও শান্তিবিধান হেতু তিনি করুণাময়ী মাতা ছিলেন। এইরূপে তাঁহাতে প্রতিভার সহিত লোকশিক্ষাবিধায়িনী ও লোকপালনী প্রবৃত্তির সমাবেশ ছিল। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তখন তাঁহার অনুপম লিপিনৈপুণ্য, অসাধারণ বুদ্ধিপ্রাখর্য্য ও অপূর্ব্ব যুক্তিবিন্যাসকৌশল

দেখিয়া, পারদর্শী পণ্ডিতগণ তদীয় প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইতেন: তিনি যখন অভিমান ও তেজস্বিতায় উন্নত হইয়া আত্মস্বার্থেও পদাঘাত করিতেন, তখন লোকে সেই অপূর্ব্ব তেজস্বিতার প্রখর দীপ্তিতে চমকিত হইয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে হতবুদ্ধি হইয়া থাকিত; আর তিনি যখন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখিতের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, তখন সেই অনাথগণ তাঁহার অপরিসীম দয়ায় ও প্রীতিস্নিগ্ধ মুখমণ্ডলের প্রশান্তভাবে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করিত। এইরূপ বিভিন্ন শক্তির সমবায়ে, তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণাবতারস্বরূপ মহাপুরুষ ছিলেন।

এই মহাপুরুষের মহাদৃষ্টান্ত কি আমাদের উপেক্ষার বিষয় হইবে? আমরা কি ইহাতে কিছু শিক্ষালাভ করিব না? যিনি লোকহিতব্রতে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন, আমরা কি তাঁহারই উদ্দেশে, তাঁহারই পবিত্র নামে সেই ব্রতপালনে যত্নশীল হইয়া, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না? পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিতার দৃষ্টান্তে সমগ্র পঞ্জাব সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও তেজঃপ্রভাবে অনমনীয় হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত গুরু গোবিন্দের মহামন্ত্রের মহীয়সী শক্তি তিরোহিত হয় নাই। সেই শক্তিতেই বেদকীর্ত্তিত পবিত্র পঞ্চনদে অপূর্ব্ব বীরত্বের বিকাশ দেখা গিয়াছে। যিনি পরসেবাতেই সমস্ত বিষয়ের উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপদেশ কি তদীয় স্বদেশবাসিগণের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হইবে না? তাঁহার পবিত্র নামে যে পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তদুপলক্ষে আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। আশা আছে, সর্ব্বত্র এইরূপ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকিবে। মহাপুরুষের দৃষ্টান্তে আবার এই দেশে অমৃতপ্রবাহের আবির্ভাব হইবে। আবার এই দেশ হীনতা-পঙ্কে

নিমজ্জিত না হইয়া, মহৎকার্য্যের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। যে জাতি শত তাড়নাতেও বিচলিত হয় না, "শত আঘাতেও বেদনা বোধ করে না," শত উত্তেজনাতেও জাড্যদোষ বিসর্জ্জন দেয় না, সেই জাতি স্বার্থপরতার মোহিনী মায়ায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পরানুগত্য, পরমুখ-প্রেক্ষিতায় আপনাদের হীনভাব না দেখাইয়া এবং সর্ব্ববিষয়ে "নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়" না হইয়া, বিশ্বজয়ী পুরুষসিংহের প্রবর্ত্তিত পথানুসরণে বিশ্বসংসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। *

* ১৩০০ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থে কলিকাতাস্থিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভাগৃহে "বিদ্যাসাগর-পুস্তকালয় ও ঝামাপুকুর পাঠাগারের" সভ্য-গণের যত্নে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমার দত্ত অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ। মস্তিষ্কের শক্তিতে এবং হৃদয়ের উদার ভাবে, তিনি নিঃসন্দেহ অক্ষয় কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা সৌভাগ্যে তাঁহার কালাতিপাত হয় নাই। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন; অর্থাভাবপ্রযুক্ত পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহে সমর্থ হয়েন নাই। অক্ষয়কুমার বাল্যে দরিদ্রভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন; যৌবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্য-কষ্টে অবসন্ন হইয়া, বিদ্যাশিক্ষার জন্য এক জন আত্মীয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, শেষে দারিদ্র্য-প্রযুক্তই অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য নানা ক্লেশ সহিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ কষ্টে পড়িলেও, তাঁহার শিক্ষানুরাগ মন্দীভূত হয় নাই। পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ বাল্যকালে অনাবিষ্ট ভাবে থাকিয়া এবং চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়াও শেষে মহৎ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। যে বালক ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিত; দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া, খাবার জিনিস লইত; উদ্ধত ও দুঃশীল বালকদিগের সহিত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; আত্মীয়গণ হতাশ হইয়া, যাহাকে সুদূরবর্ত্তী স্থানে, অপরিচিত

জন্ম। মৃত্যু।

১লা শ্রাবণ, ১২২৭। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৩।

নবদ্বীপের অধীন চুপীগ্রামে।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত।

লোকের মধ্যে অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য পাঠাইতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই; সেই বালকই প্রকৃত বীর পুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে যে বালক পথিকদিগকে নিপীড়িত করিত; কুলকামিনীদিগের জলের কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিত; শালগ্রাম ঠাকুরকে পুষ্করিণীর জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত; শেষে সেই বালকই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। অসামান্য জ্ঞানবৈভবে তিনি আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানিসমাজে সম্পূজিত হইতেছেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার কখনও এরূপ উদ্ধত ভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি যৌবনে জ্ঞানলাভের জন্য যেরূপ নানা বিষয়ে অভিনিবেশ দেখাইতেন, বাল্যকালেও তাঁহার সেইরূপ অভিনিবেশ পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি যখন গুরুমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যারম্ভ করেন, তখন তাঁহার যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সেইরূপ ধীরতা দেখা গিয়াছিল। তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসায় তদীয় গুরু অতিমাত্র চমকিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে তাঁহার রীতিমত শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পিয়ার্সন সাহেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভূগোল এবং জ্যোতিষ দেখিয়া, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার। নানা বিষয়ে জ্ঞানসংগ্রহ করিতে হইলে, ইংরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক। সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তাদৃশ সুযোগ ছিল না। ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প, এবং ইংরেজী শিক্ষা করাও ব্যয়সাধ্য ছিল। এদিকে অক্ষয়কুমার নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্য-প্রযুক্ত ইংরেজী শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তিনি দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন হইয়া, অভীষ্টসিদ্ধির আশা বিসর্জ্জন দিলেন না। এক জন আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে কলিকাতার একটি

ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বিদ্যালয়ে আড়াই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একটি ডুবাল বা হীনের গৌরবের কারণ হইতে পারে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের অতি অল্প অংশ মাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফলতঃ, স্বাবলম্বনই তাঁহার সমুদয় উন্নতির মূল ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষার ভিত্তি মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অসামান্য পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি এই ভিত্তির উপর যে উচ্চতম জ্ঞানমন্দির-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন, পরিশেষে প্রশান্তমূর্ত্তি শৈলশ্রেষ্ঠের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও উন্নত ভাব দেখিয়া, শাস্ত্রদর্শিগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দারিদ্র্যপ্রযুক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু দারিদ্র্যকষ্টে নিপীড়িত হইয়াও জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিলেন না; পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যথানিয়মে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াও তিনি আড়াই বৎসরের অধিক কাল তথায় থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার শিক্ষার সূচনা হইয়াছিল। তিনি পরিশেষে এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া অসামান্য স্বাবলম্বনবলে অনেক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই জ্ঞানসংগ্রহে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন; যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সহায় হইয়াছে; যাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই কোন অভিনব বিষয়ের

পরিজ্ঞানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবিধবিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নানা স্থানে গমন করিয়া, নানা বিষয় দেখিয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন। জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির কিছুই উদাসীন ভাবে নিরীক্ষণ করেন না। বিশাল বিশ্বরাজ্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতি সামান্য বিষয় হইতে তিনি যে জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করেন, তাহার অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে সমগ্র জ্ঞানিসমাজ চমকিত হইয়া উঠে। বৃক্ষ হইতে ভূতলে ফলের পতন অনেকেই দেখিয়া থাকেন, কিন্তু নিউটনের সমক্ষে ঐ ঘটনা বিশ্বরাজ্যের একটি মহান্ আবিষ্কারের সহায় হইয়াছিল; ফলতঃ জ্ঞানিগণ অভিনিবেশ-সহকারে সমুদয় বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যেরূপ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেরূপ জনসমাজে জ্ঞানপ্রচারের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়া থাকে। অক্ষয়কুমারের অনুসন্ধিৎসা ও সাভিনিবেশ দৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যের যার পর নাই উপকার হইয়াছে। তিনি স্বকীয় সূক্ষ্ম অনুসন্ধানবলে যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে এখন সাহিত্যসেবকগণ আপনাদের কৌতূহলতৃপ্তির সহিত জ্ঞানবৃদ্ধি করিতেছেন।

যে সময়ে অক্ষয়কুমার সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, সে সময়ে কবিতার প্রাধান্য ছিল। কবিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের প্রধান পরিচালক ছিলেন। তাঁহার চিত্তবিমোহিনী কবিতার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে পরিকীর্ত্তিত হইত। যাঁহারা ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিভাগুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সে সময়ে এই কবিপ্রবরের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। অক্ষয়কুমারও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু কবিতারচনায়

তিনি কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যসমাজের গোচর হয় নাই। কবিপ্রবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল কবিতা-রচনাতে ব্যাপৃত থাকেন নাই। গদ্যরচনাতে তাঁহাদের অসামান্য ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা গদ্য গ্রন্থের প্রচার করিয়া, সাহিত্যসমাজের বরণীয় হইয়াছেন। যাহা হউক, অক্ষয়কুমারের গদ্য-রচনা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এরূপ প্রীত হয়েন যে, তিনি অক্ষয় কুমারকে কবিতার পরিবর্ত্তে গদ্য রচনা করিতে পরামর্শ দেন। অক্ষয়কুমার অতঃপর নানাবিষয়ে গদ্য রচনা করিতে থাকেন। বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপে উদ্দীপনা ও ওজস্বিতার অক্ষয় প্রস্রবণস্বরূপ বিশুদ্ধ ভাবের গদ্যরচনার সূত্রপাত হয়।

যাঁহারা সংসারে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে তাঁহাদের অনেকের আবির্ভাব হইয়াছে। বিশেষতঃ যাঁহারা সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনপূর্ব্বক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখে দিনপাত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে গদ্যসাহিত্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের তদনুরূপ উন্নত অবস্থা ঘটে নাই। মিল্টন্, জন্‌সন্ ও আডিসন্ প্রভৃতির রচনায় ইংরেজী গদ্যসাহিত্য যখন সমৃদ্ধ, তখন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের কোন লক্ষণ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির সূত্রপাত হয়। যাঁহারা উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদিগের অবস্থা অপেক্ষাও হীনতর ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের তাৎকালিক লেখকগণ আত্মপোষণ বিষয়ে যেরূপ অপরিণামদর্শিতা ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধাতা সুলেখকগণ

তদ্রূপ কোনও অপকার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হয়েন নাই। ইংরেজী গ্রন্থকারগণ দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু পরকীয় সাহায্য আশানুরূপ হইলেও তাঁহাদের দরিদ্রভাব ঘুচিত না। তাঁহারা এক সময়ে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইতেন, অন্য সময়ে ছিন্ন ও মলিন পরিচ্ছদে কষ্টদায়ক ঋতুর পরাক্রম হইতে দেহ রক্ষা করিতেন; এক সময়ে সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হইতেন, অন্য সময়ে সামান্য খাদ্যের জন্য অপরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন; এক দিন উৎকৃষ্ট গৃহে অগ্নির আধারের সমক্ষে সুষুপ্তিসুখ উপভোগ করিতেন, অন্য সময়ে দুরন্ত শীতে কম্পবান্ হইয়া, অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিতেন; এক দিন মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন, অন্যদিন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া, অপরের নিকটে ভিক্ষাপ্রার্থী হইতেন। এইরূপে দিনযামিনীর আবর্ত্তনের ন্যায় তাঁহাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আবর্ত্তিত হইত। অর্থের দায়ে তাঁহারা অপরের নিকটে নিগৃহীত হইতেন। জন্‌সন্ ও গোল্ডস্মিথ্ অর্থের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। জন্‌সন্‌কে ঋণের দায়ে অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। ষ্টীলি ঋণদায়ে আদালতের কর্ম্মচারীর নিকটে তাড়না সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিল না। রাজা এবং সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ ইঁহাদের গুণপক্ষপাতী ছিলেন। এই পক্ষপাত কেবল প্রশংসাবাদমাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। গুণপক্ষপাতী উৎসাহদাতার অনুগ্রহে লেখকগণ যথোচিত অর্থলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী সমর্, মণ্টেগ্ ও গোডল্‌ফিন্ আডিসনের ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ষ্টীলি রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজার অনুগ্রহে জন্‌সনের যাবতীয় অভাবের মোচন হইয়াছিল। ফলতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যে সকল ব্যক্তি গবেষণাকৌশলে, রচনানৈপুণ্যে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে সাহিত্যসমাজে সুপরি-

চিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে রাজকীয় কর্ম্মলাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। নিউটন যেমন রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, আডিসন্ প্রভৃতি সেইরূপ রাজ্যসংক্রান্ত কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনাদের অভাবমোচনের সহিত সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখ এবং নানারূপ বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গ্রন্থকারদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের পর ইংলণ্ডের গ্রন্থকারগণের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ঐ সময় হইতে রাজনীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানুশীলনের পথ প্রশস্ততর হয়। ইংলণ্ডের জনসাধারণের সভার আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, গদ্যলেখকগণ এই সভার সদস্যরূপে পরিগৃহীত হয়েন। ইঁহারা সাহিত্যসেবকদিগকে সমুচিত উৎসাহ দিতে বিমুখ ছিলেন না। প্রতিভাশালী সুলেখকগণ ইঁহাদের সাহায্যে রাজকীয় বৃত্তি লাভ করিয়া, সাহিত্যের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইতেন। যদি সমর্ বা মণ্টেগ্ সাহায্যদানে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আডিসন্ নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন না। যাঁহার প্রতিভা ও লিপিক্ষমতায় ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয়, তাঁহার সেই প্রতিভা মলিন এবং ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া যাইত।

অক্ষয়কুমার যে সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে প্রবিষ্ট হয়েন, সে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের অবস্থা উন্নত বা বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ তাদৃশ প্রবল ছিল না। যাঁহাদের রচনাগুণে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন। তাঁহাদের নানারূপ অভাব ছিল। জীবিকানির্ব্বাহে তাঁহাদিগকে দুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইত। কিন্তু তাঁহারা অদ্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, কল্য ছিন্ন ও মলিন বসনে আত্মদৈন্য প্রকাশ

করিতেন না; অথবা অন্য নানা ভোগে রসনার তৃপ্তিসাধন করিয়া, কল্য ভিক্ষান্নের জন্য লালায়িত হইতেন না। তাঁহারা আপনাদের পরিশ্রমে যাহা সংস্থান করিতেন, তদ্দ্বারাই আপনাদের অভাব মোচন করিয়া, স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে যত্নশীল হইতেন। রাজা বা রাজমন্ত্রী তাঁহাদের উৎসাহদাতা না হইলেও, স্বদেশের শাস্ত্রনিষ্ঠ ও বিদ্যানুরাগী ধনীর নিকটে তাঁহারা উপকৃত হইতেন। অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় একটি মহাপুরুষের সাহায্যে ও উৎসাহে স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অগ্রসর হয়েন। ইঁহার সাহিত্যানুরাগে, ইঁহার যত্নে, ইঁহার স্বদেশহিতৈষিতায়, অক্ষয়কুমারের অসামান্য উৎসাহের সঞ্চার হয়। অক্ষয়কুমার এইরূপে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া সাহিত্যসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি এই আত্মোৎসর্গের ফল। এই মহৎ ফল দেখিলে, একটি সমর্ বা একটি মণ্টেগ্ আপনাকে পরমসৌভাগ্যশালী মনে করিতে পারিতেন।

তত্ত্বদর্শী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্য, যেরূপ গবেষণাকৌশল, যেরূপ বিচারনৈপুণ্য, তাঁহার রচনাপ্রণালীও সেইরূপ ওজস্বিতাময়ী, গাম্ভীর্য্যশালিনী ও চিত্তবিমোহিনী হইল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যে পদ্য-রচনার প্রাদুর্ভাব ছিল। সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পদ্যলেখকদিগের পরিচালক ছিলেন। এই শ্রেণীর লেখকগণ কল্পনাবলে বা সৃষ্টিকৌশলে, তাদৃশ উন্নত ছিলেন না। গম্ভীর ভাব তাঁহাদের রচনায় পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহারা পদ্যের সহিত গদ্যও লিখিতেন। কিন্তু তাঁহাদের পদ্য ও গদ্য উভয়ই উন্নত ও প্রগাঢ়ভাবের সম্পর্কশূন্য ছিল। তাঁহারা ভাবুক না হইলেও, তাঁহাদের রচনায় এরূপ অনায়াসলভ্য মাধুর্য্য ছিল যে, জনসাধারণ

অবলীলাক্রমে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আমোদিত হইত। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছিলেন যে, যখন আবিসীনিয়ার রাজপুত্র রাসেলাসের গুরু, পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িতে উদ্যত হয়েন, তখন পক্ষ আকাশপথে তাঁহার ভারধারণে সমর্থ হয় নাই। তিনি পক্ষসহ হ্রদের জলে পতিত হয়েন। যে পক্ষ তাঁহাকে উপরে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তিনি সেই পক্ষের সাহায্যে জলের উপর থাকিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গের তাৎকালিক লেখকগণেরও এইরূপ অবস্থা ছিল। তাঁহারা রচনাকৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, উন্নত ভাবের দিকে যাইতে পারিতেন না; কিন্তু যখন তাঁহারা নিম্নভাগে অবস্থিতি করিতেন, তখন জনসাধারণের উপর তাঁহাদের আসন থাকিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ অবস্থার মধ্যে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয়দিগকে গম্ভীর ভাষায় গভীর বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য সমুত্থিত হইলেন। তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ব্ব ভাষা-রাশিতে সজ্জিত করিল। তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; প্রকৃতি তাঁহাকে যত্নসহকারে আপনার কার্য্যকারণপরম্পরার সহিত সুপরিচিত করিয়া দিল; তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিন্তনে অগ্রসর হইলেন; অতীত যেন বর্ত্তমানের ন্যায় সমুজ্জ্বলভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল; তিনি নানা বিষয়ে উপদেশসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় অবলীলাক্রমে তাঁহার মানসপথে উদিত হইতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইতে লাগিল; প্রতি সংখ্যাতেই অক্ষয়কুমারের ওজস্বিনী ভাষার সহিত তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া পাঠকগণ অপরিসীম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি সকল বিষয়েই অক্ষয়কুমার সমান অভিজ্ঞতা ও সমান লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি যখন ধর্ম্মনীতি,

রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে অসামান্য জ্ঞান পরিলক্ষিত হইত। তিনি যখন পদার্থবিদ্যার বিষয় রচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দূরদর্শী ও সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইত। তিনি যখন পুরাবৃত্তসম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তখন তাঁহার গবেষণা-কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। তাঁহার বুদ্ধি এইরূপে সর্ব্ববিষয়ব্যাপিনী ছিল। তৎসম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এইরূপে সর্ব্ববিষয়ের আবির্ভাবে পাঠকবর্গের সন্তোষবিধায়িনী হইয়া উঠিয়াছিল। মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের কথা যখন মনে হয়, তখন নবদ্বীপের সেই একচক্ষু, দরিদ্র রামনাথের অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতার সমক্ষে সহজে মস্তক অবনত হইয়া থাকে। হল্‌দিঘাট বা থর্ম্মাপলীর উল্লেখ হইলে, সহজেই হৃদয়, প্রতাপসিংহ বা লিওনিদস্‌কে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যানুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিন্যাস-চাতুরী ও সর্ব্বোপরি সেই দীপ্তিময় বহ্নিস্তূপের ন্যায় ভাষার অপূর্ব্ব ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাজমন্ত্রীর উৎসাহে আডিসন্, জন্‌সন্ প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের শাসিত একটি দরিদ্র দেশের এক জন উদারপ্রকৃতি ভূস্বামীর উৎসাহে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্যের তাহা অপেক্ষা অল্প উপকার করেন নাই, এবং স্পেক্টেটর বা র‍্যাম্‌লার দ্বারা ইংরেজী সাহিত্য যে পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা, বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার তাহা অপেক্ষা অল্প গৌরবান্বিত হয় নাই।

অক্ষয়কুমার ১৭৬৫ শক হইতে ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ষ

কাল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এই দ্বাদশ বর্ষের পরিশ্রমে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। শাস্ত্রদর্শী বিদ্যাসাগর এবং তত্ত্বদর্শী অক্ষয়কুমার উভয়েই প্রায় এক সময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাসাগর যেমন কোমলতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজস্বিতায় উহাকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলিয়াছেন।

কথিত আছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক অতি কদর্য্য ভাষায় লিখিত হইত বলিয়া, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক বাসুদেবচরিত রচিত হয়। কিন্তু উহা অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত না হওয়াতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালপঞ্চবিংশতি ১৭৬৭ শকে মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত এবং ঐ কলেজের পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৭৬৫ শক হইতে অক্ষয়কুমারের লেখনীবিনির্গত সারগর্ভ প্রবন্ধসমূহ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর শোভিত করিতে থাকে। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি প্রকাশের পূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য অপকৃষ্ট ছিল। উৎকট সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত কথাগুলি এ ভাবে সন্নিবেশিত হইত যে, উহাতে ভাষার লালিত্য বা মাধুর্য্য কিছুই থাকিত না। পাঠকগণ সহজে উহার অর্থ পরিগ্রহ করিতেও পারিতেন না। নিম্নোদ্ধৃত গদ্য রচনায় ইহা বুঝা যাইবে:—"ধর্ম্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনি হবিষ্যাশী মৎস্যমাংসাদি আমিষ আমিষ দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ

ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন, যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট পূত সামগ্রী অখাদ্য হয়, তেমনি আমিষ্য মীনসংস্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না। অতএব আজ অবধি আমি নদী নদ হ্রদ পুষ্করিণী পল্বল প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে, তবে এতৎপর্য্যন্ত যে হইয়াছে, সে অজ্ঞানতঃ। এইরূপ মনে করিয়া নদ্যাদি পয়ঃপান পরিত্যাগ করিলেন, অন্তঃসলিলবাহিনা নদীর বারি পান করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র সফরী সংস্তুকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জল পান বর্জ্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ একদা তদম্বুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরও কৃমি কীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে ঊর্দ্ধে মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন, এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদ্বক্ত্রমধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একে তো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বক্ত্রান্তর্গত পুরীষ দুর্গন্ধ প্রযুক্ত ওয়াকার করিতে করিতে গলা ফাটিয়া মরেন। ইত্যবসরে তত্ত্বজ্ঞ এক পরমহংসস্বামী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন, ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডূক উড়ুম্বরমশক, অসদুপদেশ দুরাগ্রহে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিস্; আমার এই কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন ও জল পান করিয়া প্রাণ রক্ষা কর্। সন্ন্যাসীর এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্র করঙ্গপানীয়তে লপন ধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল।”

প্রবোধচন্দ্রিকা।

"বিদ্যা বিষয়ে ও অন্য অন্য কর্ম্ম বিষয়ে যে উদ্যোগ, তাহাকেই লোকে পরিশ্রম কহে। বাল্যাবস্থা যৌবনাবস্থাতে মনুষ্য সকল সতত সকল বিষয়ে পরিশ্রম অবশ্য করিবেব, যেহেতু পরিশ্রমেতে বিদ্যা ও ধন মান্যতা ও সুখাদি হয়, পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার কিছুই হয় না, অদৃষ্ট দ্বারা যে সুখাদি হয়, তাহাতে হানি নাই। যদ্যপি চেষ্টা করিলে কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তাহাতে হানি নাই। ইহার দৃষ্টান্ত, কুম্ভকার এক মৃত্তিকা পিণ্ডতে ঘট ও স্থাল্যাদি যাহা যাহা চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাহা নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং দেখ নানাবিধ দ্রব্য সম্মুখে আছে বটে, কিন্তু ভোজনার্থ ব্যক্তির মুখে অদৃষ্ট কি অন্নাদি প্রদান করেন? উদ্যোগ ব্যতিরেকে সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারেন না।" জ্ঞানচন্দ্রিকা।

জ্ঞানচন্দ্রিকায় পরিশ্রমের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমারও পরিশ্রমের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনার একাংশ উদ্ধৃত হইল—"অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন; কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের ফল; পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত পুষ্পপরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িৎসমবেগবিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম-শাসনসংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞানরূপ মহারত্নের আকরস্বরূপ বিদ্যামন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞানসমষ্টি-স্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদয় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। পরিশ্রম যে, পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেক দেশের অনেক গ্রন্থকার আলস্যের ভূয়োভূয়ঃ নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিশ্রম যে, কেবল পরিণামেই সুখোৎপাদক,

এমত নহে, কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর চালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে।”

অক্ষয়কুমারের ভাষা, জ্ঞানচন্দ্রিকার ভাষা অপেক্ষা কিরূপ উৎকৃষ্ট, তাহা উদ্ধৃত অংশপাঠে বুঝা যাইবে।

প্রবোধচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থের উৎকটশব্দময়, প্রাঞ্জলতাপরিশূন্য, লালিত্যহীন ভাষা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের রসময়ী লেখনীতে পরিমার্জ্জিত হয়। কথিত আছে, বেতালপঞ্চবিংশতিতে সর্ব্বপ্রথম “উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্লফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর-তিমি-মকর-নক্রচক্র-ভীষণ স্রোতস্বতী-পতি-প্রবাহ-মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল,” এইরূপ রচনা ছিল। পরিশেষে এই দীর্ঘসমাসযুক্ত রচনা পরিত্যক্ত হয়। অক্ষয়কুমারের রচনাতেও দীর্ঘ সমাস পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে রচনার লালিত্য বা মাধুর্য্য নষ্ট হয় নাই। অক্ষয়কুমার যথানিয়মে সংস্কৃত শিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। এক জন অধ্যাপকের নিকটে তিনি কিয়ৎকাল মাত্র সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইলেও, তাঁহার ভাষায় এরূপ সুপ্রণালীতে সংস্কৃত শব্দসমূহের বিন্যাস আছে যে, একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত তৎসমুদয়ের যোজন করিতে সমর্থ হইলে, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। ফলতঃ অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই; দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাকে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস করিয়া তুলেন নাই; সংস্কৃতের পার্শ্বে প্রচলিত কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার সৌন্দর্য্য-হানি করেন নাই। তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ “বাহ্য বস্তুর সহিত

মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" ; তাঁহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ "চারুপাঠ" ; তাঁহার "ধর্ম্মনীতি" ; তাঁহার "পদার্থাবস্থা" ; তাঁহার ১ম ও ২য় ভাগ "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়"; যাহাই পাঠ করা যায়, তাহাতেই তদীয় ভাষার পরিশুদ্ধ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতাপিতার সহিত যে ভাষায় কথা কহা যায় ; প্রণয়ী জনের সহিত যে ভাষায় আলাপ করা যায় ; স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনের সহিত কথোপকথনকালে যে ভাষার ব্যবহার করা যায় ; অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় করেন নাই। তাঁহার ভাষা গম্ভীর, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল, তাঁহার ভাষা সংস্কৃতের নিয়মানুসারে সমাসসমন্বিত ; কিন্তু এই গাম্ভীর্য্যে, এই সংস্কৃতশব্দবাহুল্যে, এবং এই সমাসমালায় এরূপ মাধুর্য্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় মোহিত হয়। যে নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট জাতির বেদনাবোধ নাই ; যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারী হয় নাই, জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই ; উদ্দীপনার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই ; বিরহী জনের কাতরতাপ্রকাশক রোদন বা প্রণয়ী জনের অস্ফুট প্রণয়সম্ভাষণ যে জাতির ভাষার প্রতিস্তরে পরিস্ফুট হয় ; অথবা তাণ্ডবমত্ত অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের কর্কশ কথার ন্যায় কতকগুলি অসম্বদ্ধ, শ্রুতিকঠোর শব্দাবলী যে জাতির সাহিত্যভাণ্ডারে স্তূপে স্তূপে সজ্জিত থাকে, অক্ষয়কুমার সেই জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে সুসম্বদ্ধ, সুশ্রাব্য শব্দমালায় শোভিত করিয়া তুলেন। মিল্টন্ একটি নিত্য স্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান্ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ; চিরপরাধীন, চিরনিপীড়িত ও চিরনিগৃহীত জাতির মধ্যে অক্ষয়কুমারের ভাষা মিল্টনের ভাষারও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে। মিল্টন্ যদি

উনবিংশ শতাব্দীতে এই নিস্তেজ বঙ্গের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মভূমিতে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও জাড্যদোষে সমাচ্ছন্ন লোকের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দরিদ্র অক্ষয়কুমারের লেখনীর প্রভাব-দর্শনে তাঁহারও হিংসার আবির্ভাব হইত। নির্জ্জীব ও নিশ্চেষ্ট বিষয়ের সজীবতা-সম্পাদন অসামান্য ক্ষমতার কার্য্য। অক্ষয়কুমার এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতায় নিস্তেজ ভাষার মধ্যে এরূপ তেজস্বিতা ও সজীবতার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুজ্জ্বল ভাব দেশান্তরে সভ্য সমাজেও বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর পরিশ্রমে অক্ষয়কুমারের অচিকিৎস্য শিরোরোগের সঞ্চার হয়। এই রোগে অক্ষয়কুমার জীবন্মৃত হইয়া পড়েন। কিন্তু এই জীবন্মৃত অবস্থাতেও তিনি শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করেন নাই। লোকে যে অবস্থায় পতিত হইলে, সমুদয় আশা বিসর্জ্জন দিয়া, অনুক্ষণ অন্তিম কালের প্রতীক্ষায় থাকে, তিনি সেই অবস্থাতেও অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে, অভিনব বিষয়ের সহিত পরিচালিত হইতে, এবং অভিনব গ্রন্থ প্রচার করিয়া, স্বদেশীয়দিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে, সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত ছিলেন। উৎকট রোগপ্রযুক্ত তাঁহার শরীরে সামর্থ্য ছিল না, হৃদয়ে শান্তি ছিল না, মনে স্থিরতা ছিল না। এই অবস্থায় আপনার চিরপোষিত বাসনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া, তিনি যে সকল আক্ষেপোক্তি করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় পাঠ করিলে, হৃদয় দ্রবীভূত হয়। এইরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় অক্ষয়কুমার "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়" প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থের দুই ভাগে অসামান্য গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। প্রগাঢ় তত্ত্বানুসন্ধায়ী

পণ্ডিত সুস্থাবস্থায় যে গ্রন্থ লিখিলে, আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন, অক্ষয়কুমার শরীরের নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় সেইরূপ মহাগ্রন্থের প্রচার করিয়া, অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং বিভিন্নমতাবলম্বী উপাসকদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তিনি এই গ্রন্থে যে সকল দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার যেরূপ বলবতী অনুসন্ধিৎসা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে, সেইরূপ তদীয় অসামান্য স্বদেশানুরাগ, প্রখর বুদ্ধি, বিচিত্র বিচার-চাতুরী এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ইংলণ্ডের মহাকবি অন্ধতাবস্থায় মহাকাব্য প্রণয়নপূর্ব্বক, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। কারাগারের কঠোরতার মধ্যে জগতের ইতিহাস এবং তীর্থযাত্রীর যাত্রা প্রণীত হইয়া, ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজ সমুজ্জ্বল করিয়াছে। এজন্য ইতিহাস সেই লেখকশ্রেষ্ঠদিগের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতার নিকটে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। কিন্তু যে মহাপুরুষ রোগজনিত দুঃসহ যাতনার মধ্যে, মৃত্যুর বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া, ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের ন্যায় অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা এবং তাঁহার মস্তিষ্কের অভাবনীয় শক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত, বোধ হয়, পৃথিবীর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস এ অংশে পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসের সমক্ষে বোধ হয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বি ভাবে রহিয়াছে, এবং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের কর্ম্মবীর এ বিষয়ে অসামান্য মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া, সাহিত্যবীরদিগের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থের প্রণয়নকালে অক্ষয়কুমারের মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না। এই অস্থিরতার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে অনেক ভাবের উদয়

হইয়াছে। বিশেষতঃ গরীয়সী জন্মভূমির শোচনীয় অধঃপতনের কথা যখন তাঁহার মনে হইয়াছে, তখন তিনি তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুতেই ঐ সকল ভাবের বেগ মন্দীভূত হয় নাই। তিনি ঐ ভাবপ্রবাহের আবেগে সময়ে সময়ে স্বকীয় মহাগ্রন্থ —উপাসক সম্প্রদায়ে ভারতভূমির দুর্দ্দশার উল্লেখ করিয়া, উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যে সকল মর্ম্মস্পর্শী কথা বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় পাঠ করিলে শরীর পুলকিত হয় এবং তাঁহার সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহারই বাক্যে বলিতে ইচ্ছা হয়—"ভীমজননী ও অর্জ্জুনমাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশাপথ অবলম্বন করিবেন? গগনস্পর্শিবৎ হিমালয় ও আর্য্যাবর্ত্তের বপ্রবিশেষ বিন্ধ্যাচল যাহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষের বংশে এখন এই অধম পামরস্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিতকণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তদীয় চিতাভস্মকণাও বিদ্যমান নাই। সেই সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না। * * * * কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ? কোথায় বা সে মথুরা ও উত্তরকোশলা? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ নাই। অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই। দেহ আছে, তাহাতে জীবন নাই। সাকারবাদীর অশ্বত্থমূলবিদ্ধ কবাটশূন্য জরাজীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহাতে দেববিগ্রহ বিরাজমান নাই। জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী, একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।"

বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচারে সন্তানপালন, প্রাকৃতিক

নিয়মরক্ষণ, শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে অক্ষয়কুমার যুক্তির সহিত স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এক থানি ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। বাহ্যবস্তু ও ধর্ম্মনীতি, উভয়ই এক শ্রেণীর পুস্তক। মানবকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ এবং সবল ও সুস্থ করা উভয় পুস্তকের উদ্দেশ্য। যে সকল বিষয় এই উদ্দেশ্যানুসারে গ্রন্থপ্রণেতার নিকটে সমীচীন বোধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই যুক্তির সহিত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাহ্যবস্তুতে আমিষভক্ষণবিষয়ক প্রস্তাব পড়িয়া অনেকেই সে সময়ে আমিষভক্ষণের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুতে ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় অস্মদ্দেশীয় যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অকার্য্যকর হয় নাই। অনেকে উক্ত প্রবন্ধলিখিত নিয়ম অনুসারে ব্যায়াম করিয়া, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানে যত্নশীল হইয়াছিলেন। এইরূপে অক্ষয়কুমারের তেজস্বিনী লেখনী আমাদের চিরসুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের নীতিশিক্ষার সহিত নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির পক্ষেও বিস্তর সাহায্য করিতেছে। চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের এক দিকে যেমন সদাচার ও উন্নত ধর্ম্মভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র কৌশল স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ মিত্রতা প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া যেমন সৎসঙ্গলাভের উপকারিতা বুঝিতে পারে, সেইরূপ সৌরজগতের অত্যাশ্চর্য্য নিয়মপরম্পরা বুঝিতে পারিয়া বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রণালীর পুস্তক ছিল না। অক্ষয়কুমারের প্রতিভাবলে এইরূপ গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য যেরূপ উচ্চতর বিষয়ের বর্ণনায় উন্নতি লাভ করিয়াছে সেইরূপ

উন্নত ভাব ও উৎকৃষ্ট রচনাপ্রণালীর গুণে যার পর নাই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলেন যে, অক্ষয়কুমার কেবল ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহে অভিনব বিষয়ের সমাবেশ নাই বা উদ্ভাবনাগুণে তাঁহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চতর স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। যাঁহারা এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইংরাজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনের আদর্শে চারুপাঠের স্বপ্নদর্শন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মীর্জ্জার স্বপ্নদর্শনে যাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয়কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। আডিসনের প্রবর্ত্তিত পথে পদার্পণ করিলেও, অক্ষয়কুমার অভিনব চিত্রপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। অধ্যাপক উইলসনের হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়, ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও, শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপাঠে অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের পরিজ্ঞান হয়। কোন বিষয়ের অনুকরণে কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, গ্রন্থকারকে কেবল পরানুকারী ও অনুবাদকারী বলা যাইতে পারে না। লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা থাকিলে, অনুকরণে তদীয় গ্রন্থের যথোচিত গুণ পরিস্ফুট হয়। অক্ষয়কুমার প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি অপরের অনুকরণ করিয়াও স্বকীয় গ্রন্থে এরূপ বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আদর্শ অপেক্ষা পাঠকবর্গের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতিশীল সাহিত্য, লাতিনের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ফরাসী সাহিত্যের প্রাধান্যের মধ্যে ইংলণ্ডের জাতীয় সাহিত্য সজীবিত হইয়াছে। যাঁহারা অপর সাহিত্যের আদর্শে আপনাদের সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন,

তাঁহারা অনুবাদকার বা পরানুকারী বলিয়া উপেক্ষিত হয়েন নাই। স্বদেশে তাঁহাদের যথোচিত সম্মানলাভ হইয়াছে; বিদেশেও তাঁহারা ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ বলিয়া মহিমান্বিত হইয়াছেন। ভিন্ন দেশের সাহিত্যে যাহা ঘটিয়াছে, অক্ষয়কুমারের ক্ষমতায় অস্মদ্দেশের সাহিত্যেও তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অক্ষয়কুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানগুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েই নিগূঢ় তত্ত্বনিরূপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবৃত্তি এরূপ বলবতী ছিল যে, তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ শুনিতেও ক্রটি করেন নাই। বিজ্ঞানের নিগূঢ়তত্ত্বের নিরূপণ, তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তিনি স্বয়ং যে আমোদ লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন, অপরকেও সেই আমোদের অধিকারী করিবার জন্য যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার যত্ন বিফল হয় নাই। তাঁহার রচনাপ্রণালীর গুণে বিজ্ঞানের জটিল বিষয় এরূপ পরিষ্কৃত ও সুবোধ্য হইয়াছে যে, বিজ্ঞানশিক্ষার্থিগণ আমোদ-সহকারে উহা পাঠ করিতেছেন। অক্ষয়কুমারের পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠকগণ এরূপ আমোদ লাভ করিতে পারেন নাই। অক্ষয়কুমার সরল ও কবিত্বের সরস ভাষায় "পদার্থ-বিদ্যা" লিখিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানরাজ্যে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, মাতৃভাষায় সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রচার করিয়াও সেইরূপ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ অনুসন্ধান ও গভীর আলোচনায় তাঁহার গ্রন্থসমূহ নানা বিষয়ে জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার শিরোরোগে কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন: ঐ রোগ প্রযুক্ত আশানুরূপ জ্ঞানানুশীলন না হওয়াতে তিনি কিরূপ

দুঃসহ মনোযাতনায় নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াছিলেন; কিরূপ বিঘ্ন, কিরূপ অসুবিধা, কিরূপ ক্লেশের মধ্যে তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়" সমাপ্ত হইয়াছিল; তাহা তিনি স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা যেরূপ করুণরসের উদ্দীপক, সেইরূপ গভীর শোকের পরিচায়ক। ঐ বর্ণনায় তাঁহার ক্লেশভারাক্রান্ত শোচনীয় জীবনের কথা অধিকতর পরিস্ফুট ও অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। তিনি ১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকার শেষে লিখিয়াছেন;—ন্যূনাধিক ২২ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়। এতাদৃশ বহুপূর্ব্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষরূপ সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা ভদ্রসমাজে একবারে অবিদিত নাই। আমি শারীরিক ও মানসিক, কোনরূপ পরিশ্রমেই কিছুমাত্র সমর্থ নই। বলিতে কি, আমি একরূপ জীবন্মৃত হইয়াই রহিয়াছি। বস্তুতঃ ঐ শব্দটি যেমন আমাতে প্রয়োজিত হয়, এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিতে হয় কি না, সন্দেহ। এপ্রকার অসমর্থ থাকিতে, রীতিমত শোধন করা দূরে থাকুক, পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়া তোলাও আমার পক্ষে একরূপ অসাধ্য ব্যাপার।" ইহার ১২ বৎসর পরে দ্বিতীয় ভাগ উপাসকসম্প্রদায়ের উপক্রমণিকায় তিনি শোচনীয় আত্মবিবরণপ্রসঙ্গে এইরূপ শোকোচ্ছ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন;—"না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থশ্রবণ, কোনরূপ মানসিক ও শারীরিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নই। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্তমাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এ ভাগের কি রচনা, কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন, যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটিবারও নেত্রপাত করিতে পারি

নাই।* অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ়ভাবসম্বলিত চিন্তাপ্রবাহ উপস্থিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যক্ষয় করিতেছে, স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না; কষ্ট হয় বলিয়া, অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশ্যে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তাস্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদয় এবং যাহা কিছু অন্যরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তকমধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে, যানবাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধুবিশেষের সমীপে গমনপূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ করি। যাহার ষত্ব-ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই, অপার্য্যমাণে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অর্দ্ধরাত্রেও নিদ্রাকাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া, কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তা ও আন্দোলনেও কষ্ট, নিজে দূরে থাকুক, অন্য দ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ না করা হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে, এবং ইহাতেই অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে।

* যখন কোন সময়ে একবার দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই, তখন তন্নিবন্ধন দোষোৎপত্তি না হইবে কেন? স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনদোষ সঙ্ঘটিত হওয়াতে আমাকে অতিমাত্র দুঃখিত হইতে হইয়াছে। পাঠকগণ আমার সাতিশয় শারীরিক দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া, সে বিষয়ে উপেক্ষা করেন, এই প্রার্থনা।

কোন বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাও তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি? না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হই? শরীরের অবস্থানুসারে দিনবিশেষে ও সময়বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া, তাহা শ্রবণ করিতে হইয়াছে! এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটি বা দুই একটি শব্দ মাত্র এবং কদাচিৎ কিছু অধিকও বিরচিত হয়। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া উপাসকসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদয় বাক্য যে প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখিত হয়, পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। কোন্ বাক্যটি কোন্ স্থানে বা কোন্ বাক্যের পর বিনিবেশিত হইবে, উক্তরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময় তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদয়, যে দিবস একত্র সঙ্কলন করা হয়, সেই দিনই বিভ্রাট্। পূর্ব্বোক্তরূপে, শরীরের অবস্থানুসারে দিনবিশেষে সময়বিশেষে তদর্থ ঔষধবিশেষ সেবন ও অন্য অন্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহু কষ্টে সেটি কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি। * * * * * এ অবস্থায় গ্রন্থ-প্রণয়নের অভিলাষ করা অনুচিত ও অসঙ্গত কার্য্য। ওদিকে চিরজীবন নিশ্চেষ্ট মনে কালহরণ করাও অসহ্য। তাহা স্থিরভাবে মনে করাও দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশের অভিলাষ করি, এবং পূর্ব্বলিখিত কিয়দংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই। যে সুখকর বিষয়ে একবার কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, পার্য্যমাণে দূরে থাকুক, অপার্য্যমাণেও তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিমিত্তই এরূপ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে। যখন গুরুতর কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার পথ

একেবারেই রুদ্ধ হইল, মনোহর পূর্ব্ববাসনা সমুদয় স্বপ্নকল্পিত ব্যাপার হইয়া গেল এবং অনেক বৎসর একাদিক্রমে নানাপ্রকার কষ্ট পাইয়াও যখন রোগের শান্তি না হইল, তখন কেবল ঔষধ সেবন ও পথ্যগ্রহণ দ্বারা রোগের সেবায় জীবনক্ষেপ করা অপেক্ষায় এরূপ কষ্ট স্বীকারও তৃপ্তির বিষয়। আমার পূর্ব্ব অধ্যবসায়বৃত্তির নষ্টাবশেষ স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা যদি এইরূপে কিছু কার্য্যকর হইয়া থাকে, তবে গুরুতর কল্যাণকর কার্য্যসাধনের নিতান্ত অনুপযুক্ত এই বিষম শারীরিক দুরবস্থায় তাহাও আমাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

*　　*　　*　　*

"আমার আর বলিবার কথা নাই। সকলই শোচনীয় বিষয়। অন্তঃকরণ বার্দ্ধক্যদশায় ও নানাপ্রকার শুভকর বিষয়ে যৌবনোচিত প্রবল অনুরাগপ্রভাবে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, কিন্তু শরীর যৌবনাবধিই বার্দ্ধক্যকাল অপেক্ষা নিস্তেজ হইয়া চিরদিন মৃতকল্প হইয়া রহিল। আমার জরাজীর্ণ কম্পমান লেখনীকে নিজহস্তে আর একটিবারও ধারণ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না! * ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষারম্ভ করিয়া, পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই, দুর্জ্জয় রোগ-প্রভাবে চির দিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমত কার্য্যসাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতেছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু লঘু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম। তদবধি আমার বাসনারূপ বৃক্ষবাটিকায় আর না পুষ্প না ফল কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না; শাখাপল্লবাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া গেল। কোথায় বা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিজ্ঞানবিশেষের বিশেষরূপ

অনুশীলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান চেষ্টা, * কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরিভাগসন্দর্শনবাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ব্বরনিবাস. সুপ্রাচীন মানবকীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমোন্নতি-সাধন-ব্রতে ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়বিশেষ প্রবর্ত্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থপ্রণয়ন ও স্বদেশসম্বন্ধীয় নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান কামনা রহিল! সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল! অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি একবারেই শুষ্ক হইয়া গেল।”

উদ্ধৃতাংশ দীর্ঘ হইল বটে, কিন্তু উহার সমগ্র ভাগই অক্ষয়কুমারের শোচনীয় অবস্থায় চিত্র পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিবে। জীবন্মৃত মহাপুরুষের এই মর্ম্মস্পর্শিনী আক্ষেপোক্তি যেরূপ তদীয় অনন্ত কষ্ট প্রকাশ করিতেছে, সেইরূপ চিরদরিদ্রা মাতৃভাষারও একান্ত দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছে। প্রতিভাশালী পুরুষের হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি অকালে বিশুষ্ক না হইলে, মাতৃভাষা কত পূর্ণবিকসিত, অভিনব ভাবকুসুমে সজ্জিত হইতেন! অভিনব গ্রন্থরত্নে তাঁহার কত শোভা বৃদ্ধি হইত! কিন্তু হায়। “অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল!” চিরদরিদ্রার দারিদ্রকষ্ট দূরীভূত হইল না। তাঁহার কৃতী সন্তান তদীয় দারিদ্র্যদুঃখমোচনের পূর্ব্বেই নির্জ্জীব হইয়া

* ভূতত্ত্ব বা উদ্ভিদ্ বিদ্যা অবলম্বন করিবার অভিলাষ ছিল, তাহার সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম মাত্র। একেবারেই অপরাপর সকল বাসনার সহিত সে বাসনাও নির্ম্মূল হইয়া গেল।

পড়িলেন। আর তাঁহার জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল না। কিন্তু তাঁহার মস্তিকের কি অপূর্ব্ব প্রভাব! এরূপ অবস্থাতেও তিনি মাতৃভাষার করে একটি বহুমূল্য রত্ন সমর্পণ করিতে বিমুখ হন নাই। ঈদৃশী প্রতিভার গৌরব বুঝিতে পারেন, এই দুর্দ্দশাপন্ন বঙ্গের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ কয়জন আছেন?

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিচারক সূক্ষ্মরূপে সমুদয় কার্য্য বুঝিয়া, আপনার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। তিনি বিচার্য্য বিষয়ের মূল, উহার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি, সমস্ত বিষয়েরই ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। কিন্তু ব্যবহারাজীব, একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়কেই স্থিরতর সিদ্ধান্তস্বরূপ মনে করিয়া, উহার সমর্থনে অগ্রসর হয়েন। ঐ সিদ্ধান্তের মূল কি, উহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত না হইবার হেতু কি, তৎসমুদয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। জন্সন্ সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহারাজীবের প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, দিমস্থিনিসের সময়ে এথেন্সবাসীরা পশুর ন্যায় ছিল। তাঁহার মতে গর্ব্বিত এথেন্সবাসীরা অসভ্য; যে হেতু এথেন্সে মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। যে স্থানে মুদ্রিত পুস্তক নাই, সে স্থানের জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অসভ্য বলিয়াই পরিগণিত হয়। জন্সন্ দেখিতেন, যে সকল লণ্ডনবাসী লেখাপড়া করে না, তাহারা প্রায়ই উদ্ধত হইয়া পাশব বৃত্তির পরিচয় দেয়। এজন্য তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যাহারা গ্রন্থ পাঠ করে না, তাহারা বর্ব্বর *। কেবল গ্রন্থানুশীলনে যাবতীয় জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে। কিন্তু এথেন্সবাসিগণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে তত্ত্বজ্ঞানী সক্রেতিসের পদতলে বসিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিত; প্রতিমাসে চারি পাঁচ বার পেরিক্লিসের উপদেশ শুনিত। আরিস্তোফানেস তাহাদের জ্ঞানালোক উদ্দীপিত

* Macaulay, Life of Johnson

করিতেন। লিওনিদস্ ও মিল্‌তাইদিস্ তাহাদিগকে স্বদেশহিতৈষিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিবে। জেনোফন তাহাদের সম্মুখে জাতীয় গৌরবের বিচিত্র চিত্র বিস্তারিত করিয়া রাখিতেন। তাহারা বিচারকের বিচারপ্রণালী দেখিয়া, অভিজ্ঞ হইত; যথানিয়মে সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, সুশৃঙ্খলা ও সুনীতির সম্মানরক্ষায় তৎপর হইত। এই সকল বিষয় তাহাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ ছিল। তাহারা এই সকলের অবলম্বনে সভাস্থলে যেরূপ বাক্‌পটুতা প্রকাশ করিত, যুদ্ধস্থলে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিত; লোকব্যবহারে যেরূপ শিষ্টতা দেখাইত; স্বদেশের হিতসাধনে, স্বদেশের গৌরবরক্ষণে, স্বদেশীয়দিগের প্রাধান্যকীর্ত্তনে সেইরূপ একাগ্রতা, সেইরূপ উদ্যমশীলতা এবং সেইরূপ দূরদর্শিতা প্রকাশ করিত। এইরূপ জাতি কখনও অশিক্ষিত বা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু জন্সন্ ইহা বুঝিতেন না। তাঁহার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তিনি সেইরূপ ধারণা অনুসারে জ্ঞানগরিমার নিদর্শনভূমি শূরত্ব ও মহত্ত্বের বিকাশস্থল এথেন্সকে অসভ্যের আবাসক্ষেত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার জন্সনের ন্যায় অনেক সময়ে আত্মমতের নির্দ্ধারণ করিতেন। ব্যবহারাজীব যেমন একতর পক্ষকে সর্ব্ববিষয়ে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিও সেইরূপ একতর বিষয়কে সর্ব্ববিধিসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসমাধান করিবার জন্য কতিপয় স্বীকার্য্য প্রতিজ্ঞা আছে। এগুলি কিরূপে স্বীকৃত হইল, জ্যামিতি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করে না। অক্ষয়কুমারের অনেকগুলি মত এইরূপ স্বীকৃত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অক্ষয়কুমার বলিতেন, হিন্দুর স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অসার এবং হিন্দু দার্শনিকগণ ঘোরতর বিতণ্ডাবাদী। তাঁহার মতে, যাহারা শুভাশুভ দিনক্ষণে আশঙ্কা

করে; স্বদেশী শাস্ত্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে; ব্যক্তিবিশেষের অভিসম্পাতকে অনিষ্টাপাতের হেতু বলিয়া শঙ্কিত হয় এবং প্রকৃতির বিবিধ কার্য্যের বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করে; তাহারা অশিক্ষিত। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পুরাণ যখন পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার ও অচলা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তখন হিন্দুর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্র যে, অসামান্য অভিজ্ঞতার ফল; সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র যে, পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান; তিনি তাহার অনুধাবন করিতেন না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স হইতে অধ্যাপক মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের জ্ঞানী পুরুষগণ যে সংস্কৃত দর্শনের নিকটে অবনতমস্তক হয়েন, তাহা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইত না। স্বদেশীয় শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করা যে, সুশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ, তাহা তিনি বিচার করিয়া দেখিতেন না। ইয়ুরোপখণ্ডে জ্ঞানালোকের বিকাশকর্ত্তা গ্রীস যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিত, তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতেন না। লাইকর্গাস বা সোলন্ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপূজকদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। পিথাগোরেস্ জ্যামিতির একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞার পূরণে সমর্থ হওয়াতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলি দিয়াছিলেন। ইঁহারা কখনও অশিক্ষিতের শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন না। যে মহাজাতি হইতে ইঁহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, সে জাতি কখনও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এইরূপ মত প্রচারের একটি কারণ ছিল। লর্ড আমহর্ষ্টের সময়ে যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল; মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠায় কার্য্যতৎপরতার একশেষ দেখাইয়াছিলেন; লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক্ষ যাহা সম্প্রসারিত করিয়া

তুলিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে লর্ড ডালহাউসী ও লর্ড কানিঙের সময়ে যাহা ফলসম্পত্তিতে লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল; তাহার প্রভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। পাশ্চাত্য প্রণালীতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হয়; ভূগোল ও ইতিহাস প্রণীত হয়; গণিত ও জ্যোতিষের বিষয় প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় সমাজ হইতে যে স্তিমিত আলোক নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র উদ্দীপিত করিয়া তুলে। অক্ষয়কুমার এই আলোকে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে পাশ্চাত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, যদি সেই ভাবে সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইত। পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ তাঁহার চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি ইহাতে স্বদেশীয় জ্যোতিষের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যখন পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন, পুরাবৃত্তের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, জ্যোতিষ ও গণিতের নিগূঢ় তত্ত্বের তাৎপর্য্যগ্রহণে অভিনিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটল হইল। তিনি স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে পশ্চাতে রাখিয়া, প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাশির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। মিল, হাক্স্‌লি, ডাবিন প্রভৃতির সহিত স্যার্‌ উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, বর্ণুফ্‌, লাসেন, মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা হইয়া উঠিলেন। পুরাবৃত্তের অন্ধকারময় পথে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তাঁহার আলোকবর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে গবেষণাকৌশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। উইল্‌সন্‌ যাহা সংগ্রহ

করিতে পারেন নাই; তৎকর্ত্তৃক তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে, এবং উইল্‌সন্‌ যাহার অর্থোদ্ধারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার অর্থও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের যেরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি যদি সেইরূপ সমান মনোযোগের সহিত উভয় দেশের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেন; জোন্স্‌ বা উইল্‌সন্‌, বর্ণূফ্‌ বা লাসেন যদি সমুদয় স্থলে তাঁহার পথপ্রদর্শক না হইতেন, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা অনেক দুর্জ্ঞেয় ও দুরূহ তত্ত্বের সুমীমাংসা হইত।

যাহা হউক, অক্ষয়কুমার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের বরণীয় মহাপুরুষ; সাহিত্যরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে একজন অসাধারণ কর্ম্মবীর। যখন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুরুচির প্রাদুর্ভাব ছিল; কুবিষয়ের রচনা, কুভাবের উত্তেজনা, কুকথার আলোচনা, যখন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তখন অক্ষয়কুমার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, এবং পরিশুদ্ধ রুচিতে, পরিশুদ্ধ রচনায়, পরিশুদ্ধ ভাবে উহার সমগ্র জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ-পূর্ব্বক উহাকে পবিত্র করিয়া তুলেন। এখন সেই পবিত্রতার প্রদীপ্ত জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। সংযতচিত্ত তীর্থযাত্রিগণ এখন ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, উহার অনন্ত পবিত্রভাবে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন। এই মহাপুরুষের ঈদৃশী মহীয়সী কীর্ত্তির কখনও বিলয় হইবে না। পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশ এই মহাপুরুষকে পাইলে, আপনাকে সম্মানিত মনে করিতে পারে। পৃথিবীর যে কোন সভ্য জাতি এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদের গৌরব বোধ করিতে পারে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে, তাহার ক্রোড়দেশে ঈদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের একান্ত সৌভাগ্য যে, ঈদৃশ মহাপুরুষের অনুরাগে, যত্নে ও অধ্যবসায়ে তাহার পরিশুদ্ধির সহিত পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল। এই

সৌভাগ্যের মধ্যে এক বিষয়ে বঙ্গের নিরতিশয় দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। বঙ্গের কৃতী পুরুষগণ এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মানরক্ষায় আজ পর্যান্ত উদাসীন রহিয়াছেন। কিন্তু যদি শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা সার্থক হয়, তাহা হইলে, অক্ষয়কুমারের নাম বিস্মৃতিসাগরে নিমজ্জিত হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের অসামান্য কার্য্যই তাঁহাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

জন্ম।	মৃত্যু।
২রা ফাল্গুন, ১২৩২।	১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।
কলিকাতা।	১৪ মে, ১৮৯৪ খৃঃ।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

যদি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়; হিন্দুর পরিশুদ্ধ জাতীয় ভাবের বিষয় যদি একবার স্মৃতিপথে উদিত হয়; তাহা হইলে স্পষ্ট বোধ হইবে, হিন্দু পূর্ব্বে কখনও জাতীয়-ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে—পুণ্যসলিলা সরস্বতীর পুলিনদেশে লোকসমাজের হিতার্থে পরমা শক্তির ধ্যান করিতেন; তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজবিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। হিন্দু যখন শাস্ত্রানুশীলনপূর্ব্বক অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমার পরিচয় দিতেন; তখন তিনি বিজাতীয় ভাবে পরিচালিত হইয়া, হিন্দুত্বের অবমাননা করেন নাই। হিন্দু যখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, শাসনদণ্ডের পরিচালনায় ব্যাপৃত থাকিতেন; তখন তিনি হিন্দুত্বের সেই বিশুদ্ধ পথ, লোকপালনী শক্তির পবিত্র ভাব, সর্ব্বোপরি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সেই সদুপদেশবাক্য হইতে অণুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। হিন্দুর জাতীয় বন্ধন এইরূপে সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত ছিল। এই জাতীয় বন্ধন দীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে নাই। দৃষদ্বতীর

তাঁরে পৃথ্বীরাজের অধঃপতনের সহিত হিন্দু নিয়তির নিকটে মস্তক অবনত করে। হিন্দুসমাজে মুসলমানের রীতিনীতি প্রবিষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানের ভাষা শিক্ষা করে; মুসলমানের গ্রন্থপাঠে আমোদিত হয়; মুসলমানের পরিচ্ছদ ও আচারব্যবহারের অনুকরণে যত্নশীল হইয়া উঠে; শেষে মুসলমানের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করে। মুসলমানের পর আর একটি পরাক্রান্ত জাতির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই জাতি যেরূপ শক্তিশালী, সেইরূপ সাহসসম্পন্ন; যেরূপ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত, সেইরূপ সভ্যতাভিমানী; যেরূপ দূরদর্শী, সেইরূপ গভীর শাস্ত্রজ্ঞানে গৌরবান্বিত। মুসলমান হিন্দুর বসতিস্থলে যে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, এই জাতি তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার পরিচয় দিয়া হিন্দুকে চমকিত করিয়া তুলে। হিন্দু আবার মুসলমানের পরিবর্ত্তে এই জাতির পক্ষপাতী হয়, এবং এই জাতির সাহিত্য ও ইতিহাসাদি পাঠপূর্ব্বক আত্মবিস্মৃত হইয়া, ইহাদের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। এইরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে হিন্দুর হিন্দুত্ব বিচলিত হয়। কিন্তু হিন্দু জ্ঞানগৌরবে বা বুদ্ধিবৈভবে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহে। যখন অপরাপর জাতি ধীরে ধীরে সভ্যতাসোপানে অধিরূঢ় হইতেছিল, তখন হিন্দু সভ্যতার পূর্ণবিকাশে চিরমহিমান্বিত হইয়াছিলেন! গ্রীস যে সময়ে বাল্য-লীলা-তরঙ্গে আমোদ লাভ করিতেছিল; রোম যে সময়ে আত্মগৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রীসের মুখপ্রেক্ষী ছিল; জর্ম্মণি যখন আরণ্য মৃগকুলের বিহারক্ষেত্ররূপে পরিচিত হইতেছিল, এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যখন ভীমমূর্ত্তি নরশ্বাপদদিগের ভয়াবহ কার্য্যে প্রতিমুহূর্ত্তে শৃঙ্খলাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল, তখন হিন্দুর বসতিক্ষেত্রে মনোহর কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়াছিল; দর্শনের দুরবগাহ তত্ত্বের মীমাংসা

হইতেছিল ; বেদান্তে বেদমহিমার পরিণতি ঘটিয়াছিল ; এবং অকলঙ্ক সভ্যতালোকে সমগ্র হিন্দুসমাজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

রোমের বীরপুরুষ যখন বিশাল বারিধির ক্রোড়স্থিত ক্ষুদ্র ব্রিটেনের উপকূলে পদার্পণ করে, তখন তিনি ব্রিটনদিগের উলঙ্গ দেহ, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, অরণ্যপরিবৃত পল্বলপঙ্কময় আবাসভূমি দেখিয়া আপনাদের সুরম্যপ্রাসাদময়ী রাজধানী এবং আপনাদের অপূর্ব্ব সাহিত্য-সম্পত্তি ও সভ্যতাসৌভাগ্যের জন্য আপনারাই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। রোমীয়দিগের বহু পূর্ব্বে সভ্যতাসম্পন্ন, সুশিক্ষিত গ্রীকেরা যখন পঞ্চনদের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমাগত হয়েন, তখন তাঁহারা হিন্দুর অপূর্ব্ব তেজস্বিতাসহকৃত অলোকসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান, বাসগৃহের পারিপাট্য, সুনীতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ দেখিয়া, বিস্ময়-সহকারে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা যাঁহাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের দেশ গ্রীস অপেক্ষাও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন এবং তাঁহারা, সর্ব্ববিষয়ে গ্রীকদিগেরও শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের প্রকৃত শূরোচিত তেজস্বিতা আছে ; তাঁহাদের অনন্ত রত্নের আকর অপূর্ব্ব মহাকাব্য আছে ; তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমার নিদর্শনসূচক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে ; তাঁহাদের অকলঙ্ক ও অপার্থিবভাবে চিরবিশুদ্ধ সভ্যতা আছে। তাঁহাদের বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্ত্তি-সমক্ষে লিওনিদস্ বা মিলতাই-দিসের উদ্দীপনাময়ী কাব্যপরম্পরাও হীনভাব পরিগ্রহ করিতে পারে এবং তাঁহাদের শান্তরসাস্পদ তপোবনের সামান্য পর্ণকুটীরবাসী বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষদিগের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সমক্ষে সক্রেতিস্ বা পিথাগোরেস্ও অবনতমস্তক হইতে পারেন। হিন্দুর এই মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে ; এক জনপদের পর অপর আর এক জনপদের আবির্ভাব হইয়াছে ; এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় ঘটিয়াছে ; এক স্থানের পর আর এক স্থানে পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে ; কিন্তু হিন্দুর এই বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ

বিচলিত হয় নাই। অতীতদর্শী ঐতিহাসিক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে হিন্দুর অতীত গৌরবের কথা ঘোষণা করিতেছেন। আর যাঁহারা অসভ্য ও অনক্ষর বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা এখন সভ্যতার শ্রীসম্পন্ন ও জ্ঞানগৌরবে মহিমান্বিত হইয়া, হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাশি সংগ্রহ করিতেছেন, এবং সেই বিশ্বহিতৈষী বংশের ঈদৃশ শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়া, কালের অভাবনীয় শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন।

যাঁহারা সমবেদনপর; উদারতা যাঁহাদিগকে অপরের প্রতি প্রীতিপ্রকাশে উত্তেজিত করিতেছে; তাঁহারা হিন্দুর এই দুর্গতিতে অবশ্য দুঃখিত হইবেন। হিন্দু এখন পূর্ব্বতন গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের মোহমন্ত্রগুণে করসূত্রধৃত ক্রীড়াপুত্তুলের ন্যায় নর্ত্তিত হইতেছে, এবং সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আপনারাই আপনাদিগকে হেয় করিয়া তুলিতেছে। এই শোচনীয় সময়ে আমাদের দেশে একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল; একটি মহাপুরুষ পাশ্চাত্যশিক্ষার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইয়াও, সেই দুর্দ্দমনীয় শিক্ষাস্রোতের মধ্যে স্বদেশীয়-দিগকে পূর্ব্বতন মহত্ত্বের কথা বুঝাইবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভূদেব যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তিনি পাশ্চাত্য-ভাবে সুশিক্ষিত ছিলেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার তাঁহার পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষালাভ করিয়া, তিনি পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। তাঁহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে ভাসমান হইয়া, পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যখন কোন একটি অভিনব বিষয়ের চিত্তবিমোহনভাব সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন সেই বিষয়ের সহিত

সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা জন্মে। দেশের নিয়ন্তা বা তদনুরূপ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যখন সেই বিষয়ের পক্ষপাতী হয়েন, তখন হৃদয়াবেগের সংবরণ করা অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যিনি পিতৃপুরুষাগত প্রাচীন বৈভবের প্রতি দৃক্‌পাত না করেন, তাঁহার নিকটে এই অভিনব বিষয়ই জীবনসর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত হয়। যাঁহার পুরাতন বৈভব নাই, তিনি আপনাদের সকল বিষয়ই বিসর্জ্জন দিয়া, অভিনব বিষয়ের সহিত একীভূত হইয়া পড়েন। রাজপুতনার কোন কোন রাজ্যাধিপতি যখন মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েন, তখন তাঁহারা প্রাচীন আভিজাত্যের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। আপনাদের জ্ঞানগরিমা, আপনাদের বংশোচিত পবিত্রতা, আপনাদের আভিজাত্যসম্পত্তিতে চিরশোভাময়ী অপূর্ব্ব সভ্যতা, সমস্ত বিষয়ই ভুলিয়া, তাঁহারা মোগলের চিত্তবিমোহিনী সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়েন, এবং মোগলের সহিত একীভূত হইয়া, আপনাদিগকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন। বীরপ্রবর সেকন্দর শাহ যখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচ্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন সেই সকল জনপদের অধিবাসিগণ প্রীতির সহিত গ্রীসের সভ্যতা বা রীতিনীতির পক্ষপাতী হয়; যেহেতু তাহাদের সভ্যতা বা রীতিনীতি, গ্রীসের রীতিনীতি অপেক্ষা উন্নত ছিল না। রোম যখন গলের উপর জ্ঞানালোক বিস্তার করে, তখন গলের অধিবাসীরা উহার উজ্জ্বলভাবে বিমুগ্ধ হয়; যেহেতু গলের জ্ঞানগৌরব বা বুদ্ধিবৈভব কিছুই ছিল না। আমাদের দেশে প্রথম যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন যাঁহারা সেই শিক্ষালাভ করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম পিতৃপুরুষাগত বৈভবের অধিকারী হয়েন নাই। স্বদেশের অতুলনীয় সাহিত্য তাঁহাদের আয়ত্ত হয় নাই; স্বদেশের শাস্ত্রভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাশি তাঁহাদের সমক্ষে প্রভাজাল বিস্তার করে নাই; স্বদেশের চিরমহিমান্বিত সভ্যতার ইতিহাস তাঁহাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়

নাই। এই সময়ে যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাঁহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, শেক্ষপীয়র যখন তাঁহাদের হৃদয়ে অচিন্ত্যপূর্ব্ব ভাবস্রোত প্রবাহিত করিলেন; মিণ্টন যখন তাঁহাদিগকে কল্পনার উচ্চতর গ্রামে তুলিয়া দিলেন; বেকন যখন তাঁহাদের হৃদয় চিন্তাপ্রবাহে আন্দোলিত করিয়া তুলিলেন; গিবন যখন সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় তাঁহাদের মানসপটে অতীত ঘটনার বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করিলেন; তখন তাঁহারা সর্ব্বাংশে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। দুর্দ্দমনীয় অভিনব ভাবপ্রবাহের অভিঘাতে তাঁহাদের কেহ কেহ উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সময়ে ভূদেব অচলশ্রেষ্ঠের ন্যায় অবিচলিত ছিলেন। তিনি ধীরভাবে পাশ্চাত্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন। অভিজ্ঞতাসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের প্রবর্ত্তিত পথই তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। যে দিন তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন, সেই দিন ভূগোলের অধ্যাপক তাঁহাকে কহেন,—"ভূদেব! এখন তোমাকে ভূগোল পড়িতে হইবে। পৃথিবী গোলাকার ও সচলা, কিন্তু বোধ হয়, তোমার পিতা এ কথা স্বীকার করিবেন না।" ভূদেব কোন কথা কহিলেন না। নীরবে অধ্যাপকের উপদেশ শুনিলেন। বাড়ীতে যাইয়াই তিনি পিতাকে অধ্যাপকের কথা জানাইলেন। তাঁহার পিতা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"কেন? পৃথিবীর আকার গোল। আমাদের শাস্ত্রেও এ কথা আছে। গোলাধ্যায়ের অমুক স্থান দেখ। ভূদেব তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থান বাহির করিয়া দেখিলেন, লেখা রহিয়াছে—"করতলকলিতামলকবৎ গোলম্ *।" ভূদেবের আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। সুকুমারমতি বালক পিতৃমুখে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণসূচক উপদেশ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি পরদিন অধ্যাপকের সমক্ষে নম্রভাবে অথচ তেজস্বিতা-সহকারে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিলেন। ভূদেব

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্ত চরিতে ভূদেব বাবুর পত্র।

বাল্যকালেই শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষায় এইরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন! যে মহারথ অতঃপর সম্মুখসংগ্রামে হিন্দুত্বের প্রাধান্য স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, বাল্যকালেই এইরূপে তাঁহার হৃদয়ের প্রতিস্তরে অপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। এই মহাশক্তিতেই তিনি অজেয় হইয়া স্বকীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন।

ভূদেব দরিদ্র অধ্যাপকের পুত্র। তাঁহার পিতা কলিকাতায় বাস করিতেন। অধ্যাপনা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। ক্রিয়াকাণ্ডের নিমন্ত্রণ প্রভৃতিতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহা হইতে তিনি অতিকষ্টে পুত্রের ইংরেজী শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন! কথিত আছে, এক সময়ে অর্থাভাবে ভূদেবের পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাঁহার সহাধ্যায়ী মধুসূদন এ বিষয় জানিতে পারিয়া, মাতার নিকটে যে টাকা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে বৃত্তি পাওয়াতে ভূদেবকে এই সাহায্য লইতে হয় নাই। কালক্রমে বঙ্গের এই প্রতিভাশালী পুরুষদ্বয় বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিভার পরিচয় দিয়া, চিরস্মরণীয় হয়েন। যাহা হউক, ভূদেব দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন না হইয়া, মনোযোগের সহিত হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষা করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পুত্র ইংরেজীতে সুপণ্ডিত হইয়া, ব্রাহ্মণত্বের নিরতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য, ইংরেজী দর্শন, ইংরেজী ইতিহাস, তাঁহাকে ইংরেজী ভাবে পরিণত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন; সেই সাহিত্য তাঁহাকে জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের রত্নরাশি সৌন্দর্য্যপরিগ্রহে সামর্থ্য দিয়াছিল; তিনি ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই শাস্ত্র তাঁহাকে জাতীয় দর্শনশাস্ত্রের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির পরিজ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিল; তিনি ইংরেজী ইতিহাসপাঠে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস তাঁহাকে জাতীয় ইতিহাসের মহত্ত্বরক্ষায় নিয়োজিত

রাখিয়াছিল। তিনি বিদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনা করিয়া, অধঃপতিত আত্মজাতিকে জাতীয় ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা, তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এইরূপ বলবতী ছিল। তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, দুই বৎসর মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। কিন্তু ইংরেজীর অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকাতে তিনি প্রথমে মুগ্ধবোধপাঠে তাদৃশ যত্ন প্রকাশ করেন নাই। শেষে সংস্কৃত ভাষাই তাঁহার চিত্তবিনোদনের প্রধান বিষয় হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি হিন্দুকলেজে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরেজীতে তাঁহার অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতাগর্ব্বে অধীর হইয়া তিনি সংস্কৃত বা বাঙ্গালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। তিনি সংস্কৃতে অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিস্মিত করিয়া তুলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার সমক্ষে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষাভিমান সঙ্কুচিত হইয়াছিল। তাঁহার জাতীয় ভাবপ্রবাহের প্রখর বেগে বিজাতীয় ভাবের সঙ্কীর্ণ, পঙ্কিল প্রবাহ একবারে শক্তিশূন্য হইয়াছিল। যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, লোকসমাজে আপনাদিগকে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন; সভাস্থলে ইংরেজী ভাষায় জলদগম্ভীরস্বরে বক্তৃতা করিয়া, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের লোকশিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতির রহস্যভেদ করিয়া থাকেন; এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাঘটিত সমস্ত বিষয়ের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া আপনাদের জ্ঞানসম্পদের জন্য আপনারাই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন, ভূদেব তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষিত হয়েন নাই। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই পাশ্চাত্যভাবে দর্শন করেন। কিন্তু ভূদেব স্বদেশের কোন বিষয়ে— স্বকীয় সমাজের কোন স্তরে পাশ্চাত্য ভাবের রেখাপাত করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি যেরূপ ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন; সেইরূপ

সংস্কৃত শাস্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন ; যেরূপ ইংরেজসমাজের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশীয় সমাজেরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংরেজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের জাতীয় প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজের নিকটে যাহা কিছু শিখিলে আপনাদের জাতীয় সমাজের সঞ্জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে, তিনি স্বদেশীয়দিগকে তাহাই শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু সকল বিষয়েই ইংরেজসমাজের অনুকরণে তাঁহার যার পর নাই বিরাগ ছিল। তিনি আপনাদের জাতীয় সমাজের স্থিতিসাধন জন্য ইংরেজের নিকটে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েন নাই ; উহার শক্তিসঞ্চারের জন্যও সর্ব্বাংশে ইংরেজের মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকেন নাই। এ বিষয়ে আপনাদের অমূল্যরত্নের আকর শাস্ত্রই তাঁহার অবলম্বনীয় ছিল। হিন্দুর অকলঙ্ক জাতীয় ভাব, অপূর্ব্ব জাতীয় গৌরব, সংক্ষেপে হিন্দুর অপাপবিদ্ধ হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্রেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ভূদেব সমালোচক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ। তিনি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার জন্য কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তদীয় লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনাবৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যসংসারে ভূদেব ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কর্ম্মপটুতা ও সারগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতের সমালোচনায় তাঁহার ভাবুকতার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরচরিত সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের একটি অপূর্ব্ব রত্ন। ভূদেব এই অপূর্ব্ব রত্নের উজ্জ্বলভাব পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। বহুদিনের পর রামচন্দ্র যখন শূদ্রমুনির উদ্দেশে দণ্ডকারণ্যে উপনীত হয়েন ; গোদাবরীতটের অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বত, বৃক্ষশ্রেণী, অরণ্যচরী মৃগকুল যখন তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, তখন তাঁহার সীতানির্ব্বাসন-শোক নবীভূত হইয়া উঠে। তিনি

এক সময়ে সীতার সহিত এই পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিতেন ; এই বৃক্ষশ্রেণীর সুস্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া, অরণ্যবাসের কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন ; এই মৃগকুলের প্রীতিময় প্রশান্তভাবে পরিতৃপ্ত হইতেন। এখন সেই সকল রহিয়াছে, কেবল সেই অরণ্যবাসসহচরী সীতা নাই। দুঃসহ শোকে রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কবির অপূর্ব্বকৌশলে এই স্থলে ছায়াময়ী সীতা আবির্ভূতা হইলেন। ছায়াময়ীর স্পর্শে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র সেই স্পর্শসুখের অনুভব করিতে করিতে সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন ;—

"প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥"

রামচন্দ্র সীতাকে দেখিতে পাইতেছেন না। সীতা ছায়ামাত্রে পর্য্যবসিতা হইয়াছেন। কবির এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতত্ত্ব ভূদেবের প্রতিভায় বিশ্লেষিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের শোকের গাঢ়তা বুঝিতে হইলে, এই ছায়াময়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। যে শোক মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি প্রসারিত করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের প্রতিগ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তাহার নিদারুণ জ্বালাময় ভাব এই ছায়াময়ীর প্রতিস্পর্শে অনুভূত হইতেছে। ভূদেব কবির চক্ষে এই অলোকসামান্য কবিত্ব দেখিয়াছেন, এবং কবির ভাবে উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার উত্তরচরিতের সমালোচনা সাহিত্যসংসারে অতুল্য। ভূদেব এইরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত রত্নাবলীরও সমালোচনা করিয়াছেন।

গিবনের পূর্ব্বে বা পরে রোম সাম্রাজ্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছিলেন ; উহার অধঃপতনের বিষয়ও অনেকেই ভাবিয়াছিলেন ;

কিন্তু গিবনের মানসপটে রোম যে ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল; অপরের মানসপটে উহা সেভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। যে জগত নগরী এক সময়ে তিবরের তীরে দণ্ডায়মানা হইয়া, আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যগৌরবে বিশ্বসংসারকে চমকিত করিয়া তুলিয়াছিল; গিবন তাহার অতুল্য সমৃদ্ধি, তাহার অসামান্য প্রাধান্য, শেষে তাহার অভাবনীয় অধঃপতনের বিষয় প্রকৃত কবির ভাবে দেখিয়াছেন। হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্গ যখন স্বদেশের জ্ঞানবৃদ্ধ শ্রমণদিগের পদতলে বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন বারাণসী ও শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু ও বুদ্ধগয়া তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে অতীত গৌরবের উদ্দীপক হইয়াছিল। তুমি হিন্দু; স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়া থাক; তুমি হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিয়াছ; সমগ্র ভারতের মানচিত্রখানি যেন তোমার নখদর্পণে রহিয়াছে; ভারতের কোথায় কোন্ নগর, কোথায় কোন্ পর্ব্বত, কোথায় কোন্ নদী ইত্যাদি রহিয়াছে, তুমি মানচিত্র দেখিবা মাত্র, তৎসমুদয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পার। কিন্তু ভারতের অতীত গৌরবের নিদর্শনক্ষেত্রগুলিতে তোমার স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয় নাই, তোমার আত্মাভিমান উদ্দীপিত হয় নাই, তোমার স্বজাতিপ্রীতি তোমাকে কোন মহৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে নাই। যে সিন্ধুসরস্বতীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ত্রিকালদর্শী তপস্বিগণ বিশ্বপালনী শক্তির আরাধনা করিতেন, সেই সিন্ধুসরস্বতীর কথায় তোমার হৃদয়ে হিন্দুধর্ম্মের মহান্ ভাব অঙ্কিত হয় নাই। ভারতে সেই কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য রহিয়াছে; সেই হরিদ্বার-জ্বালামুখী লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে; সেই কনখল-কুমারিকা আর্য্যধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিতেছে; কিন্তু এগুলি তুমি ভাবুকের চক্ষে—কবির চক্ষে দেখ নাই। হিন্দুশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের

অনুধ্যানে তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই। ভূদেব প্রকৃত কবির ন্যায় ভারতের তীর্থস্থানগুলির বিষয় ভাবিয়াছেন এবং প্রকৃত কবির ন্যায় রূপকের ভাবে প্রতি তীর্থে হিন্দুধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তদীয় "পুষ্পাঞ্জলি"তে তাঁহার এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পিতৃমুখে হিন্দুশাস্ত্রের কথা শুনিয়াছেন; শেষে হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধে আপনার চিন্তাপ্রসূত বিষয়গুলি পিতৃপদেই পুষ্পাঞ্জলিস্বরূপ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" চিরকাল বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব রক্ষা করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি অনেক সারগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা পরশুরাম-তীর্থে সমবেত হইয়াছেন। একজন বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মহারাষ্ট্রীয় গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গ্রামবাসিগণ শীতাতপ ক্লিষ্ট, বিষাদে অবসন্ন ও ভয় উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কেহ কর্ম্ম করিতে অক্ষম, কেহ পথ চলিতে অসমর্থ, কেহ বা নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে একজন আগন্তুকের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত হইল। আগন্তুক অশ্বারোহী ও ত্রিপুণ্ড্রধারী। তাঁহার কক্ষদেশে একখানি পুস্তক রহিয়াছে। আগন্তুক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, নিকটবর্ত্তী শিলাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক খুলিলেন; মৃদুমন্দস্বরে ক্ষণকাল পুস্তক পাঠ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্রোতৃবর্গকে কহিতে লাগিলেন ঃ—

"আমরা সহ্যপর্ব্বতনিবাসী। * * * আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের বাসস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্বন। সহ্য, তপস্যা এবং যোগাভ্যাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকার করা বুঝায়। আমরা ক্লেশস্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

"কষ্টস্বীকার সর্ব্বধর্ম্মের মূল কর্ম্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধান শক্তি। যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চিরতপস্বী, এইজন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চিরসঙ্গিনী।" এইরূপ গম্ভীর ভাষায়, এইরূপ গভীর শাস্ত্রীয় উপদেশ পুষ্পাঞ্জলির অনেক স্থলে পাওয়া যায়।

মিল্টন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলণ্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম এক দিনে পর্য্যবসিত হয় নাই; এক স্থানে এই সংগ্রামস্রোত অবরুদ্ধ থাকে নাই; এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজজাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্য প্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস্ দুই হাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হয়। এই দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া, তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তি-সম্পন্ন করে।* ভূদেবের সময়ে হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের ন্যায় সর্ব্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে প্রজালোকের বিচারে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদ ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া, ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই। কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড না ঘটিলেও, এই বিপ্লবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খল ভাবের আবির্ভাব হয়। নবীন ভাবের বাহুবিভ্রমে পুরাতন ভাবের

* Macaulay Milton.

স্থিতিশীলতা কিয়দংশে বিচলিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভূদেব যখন সংসারে প্রবেশ করেন, তখন বঙ্গসমাজে ইংরেজীভাবের প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সমাজের আপাত-রম্য দৃশ্য বঙ্গের শিক্ষিত যুবকের হৃদয়ফলকে মুদ্রিত হইতেছিল। এই দৃশ্যের সম্মোহনভাবে অনেক যুবক আত্মহারা হইতেছিলেন। এই পরিবর্ত্তনের যুগে—স্থিতিশীলতার সহিত পরিবর্ত্তনশীলতার, ধর্ম্ম-সম্মত ভাবের সহিত স্বেচ্ছাচারের, শৃঙ্খলার সহিত উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোরতর সংগ্রামস্থলে ভূদেব জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনে সমুত্থিত হইলেন। চারি দিকে বিরুদ্ধবাদিগণ কোলাহল করিতেছিলেন, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; বিরুদ্ধমতের সমবায়ে সম্মুখে নানা অন্তরায় ঘটিতেছিলে, তাহাতে দৃক্‌পাত নাই; ভূদেব অটলভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন; অচলভাবে পূর্ব্বতনপথভ্রষ্ট স্বজাতিকে সংযত ভাবের অবলম্বন জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুদক্ষ সারথিগণ যেরূপ অপথে ধাবিত অশ্বদিগকে সংযতভাবে রাখিয়া, সুপথে পরিচালিত করে, ভূদেবও সেইরূপ পাশ্চাত্যভাববিমুগ্ধ, পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী স্বদেশীয়-দিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার এইরূপ ধীরভাবে সমাজের স্থিতিসাধন-চেষ্টার ফল তদীয় "পারিবারিক প্রবন্ধ," "সামাজিক প্রবন্ধ" ও "আচার প্রবন্ধ"।

পারীনগরীর রাজকীয় পুস্তকালয়ে একখানি হস্তলিখিত উপকথা-গ্রন্থ আছে। পুঁথিখানি আরবী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থকারের নাম মহম্মদ কাজরিণী। এই উপকথায় খিদিজ নামক এক ব্যক্তি এইরূপে আত্মবৃত্তান্তের বর্ণনা করিতেছেন:—

"একদা আমি একটি অতি প্রাচীন ও বহুজনপূর্ণ নগরে উপস্থিত হইয়া, একজন নগরবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই নগর কত

কাল হইল, স্থাপিত হইয়াছে?” নগরবাসী কহিল, “এই নগর কত কালের, তাহা আমরা জানি না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও এ বিষয় কিছুই জানিতেন না।” ইহার পাঁচ শত বৎসর পরে আমি সেই স্থানে উপনীত হইলাম। কিন্তু নগরের কোন চিহ্নই আমার দৃষ্টি-গোচর হইল না। একজন কৃষক সেই স্থানে তৃণলতা সংগ্রহ করিতেছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেই জনবহুল নগর কত কাল হইল বিধ্বস্ত হইয়াছে?” কৃষক উত্তর করিল, “এই স্থান পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিয়াছে।” আমি কহিলাম, “এই স্থানে কি একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল না?” কৃষক কহিল, “কখনও না। আমরা যতকাল দেখিতেছি, কোন নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে শুনি নাই।” আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল। আমি পুনর্ব্বার সেই স্থানে সমাগত হইলাম; দেখিলাম, সেই বৃক্ষলতাপূর্ণ কঠিন ভূভাগ সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রতীরে একদল ধীবর ছিল, আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “পূর্ব্বতন ভূখণ্ড কত কাল হইল জলময় হইয়াছে?” তাহারা আমার কথায় একান্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, “আপনার মত লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করা কি উচিত? এই স্থান চিরকাল এই রূপই রহিয়াছে।” আমি আবার পাঁচ শত বৎসর পরে সেই স্থানে যাইয়া দেখি, সমুদ্র অন্তর্হিত হইয়াছে। নিকটে একটি লোক দণ্ডায়মান ছিল; আমি তাহাকে সমুদ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। আর পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, আমি অবশেষে দেখিলাম, সেই স্থানে একটি সুদৃশ্য নগর শোভা পাইতেছে।”*

* Calcutta Review, Vol. XLVII, p, 138, 139

খিদিজের পরিদৃষ্ট পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনশীল ভূখণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা হইতে পারে। ভারতে এক অধিপতির পর আর এক অধিপতি আধিপত্য করিয়াছেন; এক শাসনপ্রণালীর পর আর এক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এক রীতিনীতির পর আর এক রীতিনীতি সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কখনও চিরকাল একভাবে থাকে নাই। এই পরিবর্ত্তনের সময়ে যিনি একটি মহাজাতিকে পূর্ব্বতন মহত্ত্ব, পূর্ব্বতন অভিমান, পূর্ব্বতন আধ্যাত্মিক ভাবের কথা স্মরণ করাইয়া, সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ। ভূদেব এই মহাপুরুষোচিত কার্য্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ভারতের থর্ম্মাপলিতে—সেই গিরিসঙ্কট হলদিঘাটে যখন রাজপুত বীরগণ শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া চমকিত হইয়াছিল, তখন প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ তাহাদিগকে কহিয়াছিলেন, এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু যখন হিন্দুত্বের প্রতি অনাদর দেখাইয়াছে; যাহারা এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিল, তাহারা যখন পরানুকরণপ্রয়াসী হইয়াছে এবং আপনাদের চিরগৌরবময় ইতিহাস ভুলিয়া, আত্মমহত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছে, তখন ভূদেব গম্ভীরস্বরে কহিলেন, হিন্দুত্ব বিসর্জ্জন দিও না। হিন্দু হিন্দুত্বের বলেই বরণীয় ছিল। এখনও হিন্দু হিন্দুত্বের জন্যই পূজিত হইতেছে। তিনি পারিবারিক প্রবন্ধে ও সামাজিক প্রবন্ধে হিন্দুত্বের কথা বুঝাইয়াছেন। কি বিবাহপদ্ধতি, কি গৃহিণীধর্ম্ম, কি স্ত্রীশিক্ষা, কি কুটুম্বিতা, হিন্দু পরিবারের প্রায় সকল কথাই পারিবারিক প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে।

স্বদেশীয় সমাজের উপাদানের মধ্যে জাতীয় ভাবের স্থাপন ও পরিবর্দ্ধন, এই প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজতত্ত্বের বিবরণ, ইংরেজের

ভারতবর্ষে আগমনের ফল ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা সামাজিক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভূদেব বলিয়াছেন, "যুক্তি ও শাস্ত্রের মতে সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ অতি গৌরবের বিষয়। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধনপ্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসীরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দু-সমাজ এখনও অটুট ও অটল।" হিন্দু শান্তিপ্রবণ। হিন্দুসমাজবন্ধনের মূলে শান্তি নিহিত রহিয়াছে। হিন্দুর শান্তিপ্রবণতা-প্রযুক্তই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষে রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, এবং হিন্দুর শান্তিপ্রবণতা জন্যই, এক এক জন ইংরেজ ফ্রান্স বা বেলজিয়ম, প্রুশিয়া বা গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষাও জনবহুল এক একটি ভারতীয় প্রদেশ নির্ব্বিবাদে শাসন করিতেছেন। হিন্দু বারংবার অপরের অধীন হইয়াছে; এজন্য হিন্দুসমাজ কখনও নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পৃথিবীর শান্তিপ্রবণ কোন্ উৎকৃষ্ট ও সমৃদ্ধ সমাজ অপরের অধীন না হইয়াছে? ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, স্পার্টাবাসিগণ এথিনীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিল। গ্রীকেরা মাকিদনীয়দিগের অধীন হইয়াছিল। তাতারগণ চীনবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। বর্ব্বরদিগের আক্রমণে, রোমক সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল।* কিন্তু এইরূপ পরাজয়েও এথেন্স জ্ঞান-গৌরবে স্পার্টা অপেক্ষা হীন বলিয়া পরিগণিত হয় নাই; গ্রীস সভ্যতায় মাকিদনের সমক্ষে মস্তক অবনত করে নাই; বিদ্যাবুদ্ধিতে

* সামাজিক প্রবন্ধ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

তাতার চীনের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতে পারে নাই, বা সুসভ্য রোমীয়গণও অসভ্য বর্ব্বরদিগের নিম্নে স্থান পায় নাই।

ভূদেব দেখাইয়াছেন, "জাতীয়ভাব সাধন জন্য হিন্দুসমাজকে আত্ম-প্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে; ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরেজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরেজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরেজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরেজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরেজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না *।" ইংরেজ এখন অনেক বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছেন। ইংরেজের আদেশে আকাশবিহারিণী সৌদামিনী নানা স্থানে সংবাদ লইয়া যাইতেছে; ইংরেজের ক্ষমতায় সেই চঞ্চল সৌদামিনীই আবার স্থির-ভাবে শুভ্র প্রভাজাল বিস্তার করিতেছে। ইংরেজের কৌশলে মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতেছে। যুদ্ধসময়ে ইংরেজের যুদ্ধোপকরণের অসীম প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় ইংরেজের আপনার নহে। ইংরেজ টেলিগ্রাফ্ জর্ম্মনি হইতে, বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, যুদ্ধোপকরণ ফ্রান্স হইতে এবং মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ড হইতে পাইয়াছে †। হিন্দুও এইরূপে অপরাপর জাতির স্থানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিখিতে পারে। এরূপ হইলে অযথা ভক্তি আর হিন্দুকে সর্ব্বদা ইংরেজের অনুকরণে ব্যাপৃত রাখিতে পারে না।

---

* সামাজিক প্রবন্ধ, ৭৫ পৃষ্ঠা।

† সামাজিক প্রবন্ধ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

পক্ষান্তরে জ্ঞানভাণ্ডারের অনেক বিষয়কে হিন্দু আপনার বলিয়া গৌরব করিতে পারে। যে দশগুণোত্তর সংখ্যাপ্রণালীর উপর গণিতশাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হিন্দুর উদ্ভাবিত; যে প্রভাববতী চিকিৎসাবিদ্যা এক সময়ে সুদূরবর্ত্তী জনপদের পণ্ডিতদিগকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হিন্দুর প্রতিষ্ঠিত; যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "সর্ব্বভূতময়ো হি সঃ" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহারের মহামন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বপ্রথম হিন্দুর মুখ হইতে উচ্চারিত। এইরূপে হিন্দু অনেক বিষয়ে সমস্ত পৃথিবীর উপদেষ্টা। ভূদেব হিন্দুকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার জন্য হিন্দুর মহত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অধ্যাপক সীলি এক স্থলে এই ভাবে লিখিয়াছেন—"অতি প্রাচীন কালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল, অনন্তরত্নের আকর, অনুপম প্রাচীন মহাকাব্য ছিল; জ্ঞান-গরিমার ভিত্তিস্বরূপ দর্শনশাস্ত্রাদি ছিল। ঐ জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াছিল। ইংরেজ ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল হইলেও, হিন্দুর অধিকতর হৃদয়াকর্ষক বা অধিকতর কৃতজ্ঞতার উদ্দীপক হয় নাই। ঐ আলোক অন্ধকারময় স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হইত, ভারতে সেরূপ হয় নাই। সুতরাং ইংরেজের আনীত আলোক তমোনাশক উজ্জ্বল আলোক নহে। * * * আমরা হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিকৌশলসম্পন্ন নহি; আমাদের হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্যপূর্ব্ব ধারণা সম্মুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারি, হিন্দুকে সেরূপ করিতে পারি না। হিন্দু তাঁহার কাব্য লইয়া আমাদের মহত্তম ভাবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার নিকট অভিনব বলিয়া

স্বীকৃত হইতে পারে, এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে।” এক জন উদারপ্রকৃতি ইংরেজ এইরূপে হিন্দুর গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। ভূদেব প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, “স্বর্গাদপি গরীয়সী” জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। এইজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত মহাজাতির অবলম্বনীয় কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ তাহার বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন; তাঁহার কোন কোন সিদ্ধান্ত কাহারও নিকটে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; কেহ কেহ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুমোদন না করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুতা এবং তাঁহার হৃদয়ের সাধুভাবের বোধ হয়, কেহই অনাদর করিবেন না। জ্ঞানগম্ভীরতায়,স্বজাতিহিতৈষিতায় তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তিনি জাতীয় সমাজের উপকারের জন্য পাশ্চাত্য সমাজের দোষ প্রদর্শন করিলেও, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অপ্রিয় হয়েন নাই। পাশ্চাত্য সমাজভুক্ত, দূরদর্শী প্রধান রাজপুরুষও তাঁহার অভিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। †

ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রণালী ও ভাষা প্রভৃতি ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। ভাষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

---

* Seeley, Expansion of England

† Babu Bhudeb Mukerjee's "Samajikprabandha" compares the Hindu social system with that of the west, and teaches that the Hindus have very little to learn in this respect from foreigners. *** No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the lifelong study and observation of a Brahman of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy have had an equal share."—Annual Address delivered to the Asiatic Society of Bengal by the Hon. Sir Charles Alfred Elliott, K. C. S. I.

"পিতৃমাতৃহীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয়, এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে। মনুষ্যশিশুর পিতা মাতাও যাহা, মনুষ্যসমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দলবন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল, সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।

"দক্ষিণ আমেরিকার অনেকগুলি দেশে এই সকল দেশের আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ান লোকেরা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম খৃষ্টান, এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা পোর্টুগীজ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মও নাই, পূর্ব্ব ভাষাও নাই। ঐ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্ব্বতোভাবেই বিলুপ্ত।

"মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রোজাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকাখণ্ডের লাইবিরিয়ানামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনাদের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণদিগের বড়ই আশা ছিল যে, ঐ সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ঐ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রোজাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রোজাতীয় ঐ লোকগুলি লাইবিরিয়ায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো-

জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত, তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম আছে, কোট কোর্ত্তা আছে, গির্জাঘর আছে, বৈদেশিক রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজিকী সন্ধিপত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ার জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, স্বচ্ছলতাও নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য না থাকিত, তবে এত দিনে সমীপবর্ত্তী বাস্তব নিগ্রোজাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিণ-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

"রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎপ্রদেশীয় ভাষায় শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালতগুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয়-অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রাজ্যই বর্ব্বরবিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

"ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল মুসলমানদিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারত-বাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া, তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ-নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দু-

দিগেরই পুনরুজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রকৃত কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্যশক্তি ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারতসাম্রাজ্য পাইয়াছেন, বস্তুতঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

"ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিংবা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোমসাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে?

"বিচার্য্য বিষয়টিকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, তবে কেমন ভাবে থাকিবে।

"ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে, এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটি জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে—ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল, তাহারও পূর্ব্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয়ত তাহারও পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্য্যন্ত বলা যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে, দেশটি একেবারে মনুষ্যশূন্য ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পূর্ব্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মৌরভঞ্জের গম্ভীরতম বনপ্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহারা কোন প্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র

পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন্ ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা নির্ণীত হয় না।

"এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা যায় যে, জাতির বিধ্বংসে জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, যথায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এখনও শতবর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কর্ণ্‌ওয়াল প্রদেশে কর্ণিস্ নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর স্বতন্ত্র ভাষারূপে বিদ্যমান নাই—ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মদেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ঐ ভাষাটিকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল—পেগুবী ভাষাটি ব্রহ্মভাষার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। রুসিয়াধিকৃত পোলণ্ডের মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্নে পোলদিগের ভাষা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে।

"এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ-প্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লিখিত লক্ষণ গুলি বা তাহাদিগের কোনটি সংলগ্ন হয় কি না।

"পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসী একবারে নির্ব্বংশ এবং বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ব্বর, স্বল্পসংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল—জাতিপদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং সুপরিস্ফুট য় নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তদ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির

অনুক্রমেই জন্মে। বর্ব্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সঙ্কীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ-দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির সেরূপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬টি ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, এবং পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়-সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটি ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানতঃ ছয়টি, আর্য্যাবর্ত্তে (১) পাঞ্জাবী-সিন্ধু, (২) হিন্দি-হিন্দুস্থানী এবং (৩) বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া; দাক্ষিণাত্যে (৪) মহারাষ্ট্রীয় কানারি, (৫) তেলেগু, (৬) তামিল-মালায়াম। এই ছয়টির মধ্যে একটি অর্থাৎ হিন্দি-হিন্দুস্থানী ১০ কোটি লোকের ভাষা—সুতরাং পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার সমপরিমাণ লোকে হিন্দি-হিন্দুস্থানীও কহে। পাঞ্জাবী-সিন্ধুভাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ। অতএব ইউরোপের স্পেনীয় ভাষার সমান। বাঙ্গালা উড়িয়া আসামী ৫ কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মণভাষী লোকের তুল্য। মহারাষ্ট্রীয়ভাষীর সংখ্যা ২ কোটি, প্রায় ইটালীয়ভাষীর সমান। তেলেগুভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তামিলমালায়ামভাষীর সংখ্যাও ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ তুর্কভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও কিছু অধিক। এই ছয়টি ভাষার মধ্যে একটিও অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্যগ্রন্থ আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষাসকল মারা পড়িতে পারে না। জেতৃদিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত জাতির ভাষা লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনটিই ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজরাজত্বে ভারতবর্ষীয় ভাষার লোপসম্বন্ধে কোন শঙ্কা

হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই করেন না। * * *

"যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোম সাম্রাজ্যে চলিয়াছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করিয়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্য্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন হইয়া উঠে, তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয়দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন।"

যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর, পক্ষান্তরে যাঁহারা জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন, তাঁহারা উভয়েই যেন অভিনিবেশসহকারে উদ্ধৃত কথাগুলির পর্য্যালোচনা করেন। আমাদের জাতীয় সাহিত্য আধুনিক নহে। প্রাচীনত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিলে, উহা চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী কাব্যের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্য প্রাচীন ইংরেজী কাব্য অপেক্ষা অবনতি বা অনুৎকর্ষের পরিচয় দেয় নাই। ক্রমে শব্দসম্পত্তিতে, ভাববৈভবে ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আধিক্যে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইংরেজ যে পথে পদার্পণ করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ করিলে, বাঙ্গালীও বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। পরাধীনতায় সাহিত্যের ক্রমোন্নতির পথ যে অবরুদ্ধ হয় না, তাহা উদ্ধৃত উক্তিতেই প্রকাশ পাইতেছে। বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট কবিতাকুসুম পরাধীনতার সময়েই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরাধীনতার কালেই বাঙ্গালা গদ্য পরিমার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। দীর্ঘকালের পরাধীনতায় হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্ন

হইয়া যায় নাই; পরাধীনতাপ্রযুক্ত হিন্দুর সাহিত্যও কখন বিলুপ্ত হইবে না। ইংরেজ যে ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এখন জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, জাতীয় সমাজের উদ্যম, উৎসাহ ও একাগ্রতার উপর নির্ভর করিতেছে।

ভূদেব আচারপ্রবন্ধের উপক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"সদাচারের মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধিপ্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটি বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য। * *

"শাস্ত্রাচার-লোপের উল্লিখিত তিনটি হেতুই আগন্তুক। ওগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান্ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও, একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা শাস্ত্রজ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোক শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে এবং যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োধিক এবং চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে। এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্ত্র দ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্ব মলিনতা দূর হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচার-মালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-

বিষ্ঠার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহুপরিমাণে যুক্তিমুখে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। * * * * * (৩) যে ইংরাজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে, ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষা নিবন্ধন শরীর এবং মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সহানুভূতি। আমাদেরও শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সম্বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। * * *

"মনুষ্যে পশুধর্ম্ম এবং জড়ধর্ম্ম দুইই আছে। পশুধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইল, তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশুভাবের ন্যূনতাসাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা এবং শরীরের পটুতা সম্বর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এগুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধন হইয়া ঐ সকল রজোগুণসম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।"

উপক্রমণিকাধ্যায়ের এই অংশে আচার-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে

পারা যাইবে। ভূদেব হিন্দুজাতিকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য আচারপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত আচারের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

ভূদেব কেবল গ্রন্থ লিখিয়া দিনপাত করেন নাই। কেবল গ্রন্থ দ্বারা অস্মদ্দেশে স্বচ্ছলরূপে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। গ্রন্থকারদিগকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ের অবলম্বন করিতে হয়। তৃতীয় উইলিয়ম ও আনের সময়ে ইংলণ্ডে গ্রন্থকারদিগের অবস্থা যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে খ্যাতনামা গ্রন্থকারদিগের অবস্থা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় নাই। জন্সন্ যখন ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন, তখন গ্রন্থকারদিগের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয় ছিল, কনগ্রিব্ ও আডিসনের ন্যায় বিখ্যাত লেখক-গণও কেবল আপনাদের লেখনীর সাহায্যে সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সমর্থ হয়েন নাই। ভূদেব আত্মপোষণ ও পরিবারপ্রতিপালনের জন্য রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল আত্মপোষণ ও পরিবার প্রতিপালনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্রে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষায় উত্থিত হইয়াছিলেন, শেষে হিন্দুত্বের গৌরবরক্ষার উপায় করিয়া, পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণরক্ষা না হইলে এবং ব্রাহ্মণ সংস্কৃতানুশীলনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী না হইলে হিন্দুসমাজের মঙ্গল হইবে না। যে ব্রাহ্মণের অলোকসামান্য প্রতিভায় এক সময়ে ভারতে অপূর্ব্ব সভ্যতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, জ্ঞানগৌরবের নিদর্শনস্থল ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণীত হইয়াছিল, কল্পনার লীলাকাননস্বরূপ অমৃতময় কাব্যাদি প্রচারিত হইয়াছিল, সংক্ষেপতঃ যে ব্রাহ্মণ হিন্দু-সমাজের পরিচালক ও হিন্দুসমাজের গৌরবস্থল ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণের এখন কি দশা হইয়াছে? ব্রাহ্মণ এখন অন্নের দায়ে বিব্রত, পরিবার-পালনে উদ্ভ্রান্ত, ঘোরতর দারিদ্র্যে মর্ম্মাহত। অতুলনীয় সভ্যতার প্রবর্ত্তক,

অনন্তশক্তিশালী সমাজের পরিচালকের সন্তান এখন নিদারুণ জঠর-যন্ত্রণায় অপরের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। দারিদ্র্যের অভিঘাতে তাঁহাদের শাস্ত্রচিন্তা, শাস্ত্রানুশীলনপ্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অনেকে এখন চিরন্তন প্রথা বিসর্জ্জন দিয়া, সংস্কৃতের অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, অর্থকরী বিদ্যার আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেছেন। অনেকে অমৃতময়ী ভাষার দুর্দ্দশা ও অবমাননা দেখিয়া নির্জ্জনে নিরন্তর নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছেন। সংস্কৃতশিক্ষা যেন এখন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পক্ষে মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এই মহাপাপের জন্যই যেন তাঁহারা এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছেন *। পৃথিবীতে সংস্কৃত ভাষার তুল্য ভাষা নাই। এই অতুল্য ভাষার আলোচনার কি এই পরিণাম? ভূদেব এই পরিণামে মর্ম্মাহত হইয়া, হিন্দুত্বের জন্যই এক লক্ষ ষাটিহাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির জন্য, অধিকন্তু জাতীয় সমাজের পরিচালক ব্রাহ্মণের নিমিত্ত একজন গ্রন্থকার ও রাজকর্ম্মচারীর এরূপ দান তুলনারহিত। ভূদেব হিন্দুসমাজের পরিচালনে অসীমশক্তিসম্পন্ন বীর পুরুষ; হিন্দুসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার এইরূপ দান অনন্ত গৌরবে পরিপূর্ণ; হিন্দুসমাজের ইতিহাসে তাঁহার এই মহীয়সী কীর্ত্তি চির-মহিমান্বিত; যতকাল হিন্দুসমাজ অটলভাবে থাকিবে, ততকাল এই দূরদর্শী মহাপুরুষের অভিজ্ঞতা ও দানশীলতা স্বদেশপ্রেমিক হিন্দুকে জাতীয় সমাজের হিতকর কার্য্যসাধনে উপদেশ দিবে।

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের দুরবস্থার জন্য এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—"সে কাল আর এ কাল।"

জন্ম।	মৃত্যু।
১২ই মাঘ; ১২৩০।	১৬ই আষাঢ়, ১২৮০,
সাগরদাঁড়ী গ্রাম, যশোহর	২৯ জুন, ১৮৭৩।

স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রাচীন সময়ে হিন্দু যখন শিক্ষার্থী হইয়া, গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতের পালন করিতে হইত। নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভের সহিত কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাসবিদ্বেষ ও চিত্তসংযমে অভ্যস্ত হওয়া এই ব্রতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার প্রবর্ত্তক ঋষিকুলে আমরা যে, বিষয়বিরাগের সহিত অসামান্য প্রতিভার বিকাশ দেখিতে পাই, ব্রহ্মচর্য্যই তাহার একমাত্র কারণ। হিন্দুর এই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি না থাকিলে, ভারতবর্ষ বোধ হয়, প্রকৃত মহত্ত্বের আশ্রয়স্থল হইত না। বিদ্যায় মনুষ্যের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইতে পারে; বহুদর্শনে মানুষের চিত্তের প্রসারণ ঘটিতে পারে; গভীর ভাবস্রোতে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি উন্নত হইয়া উঠিতে পারে; কিন্তু চিত্তসংযমের অভাবে মানুষ কখনও মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ আবর্ত্তঘূর্ণিত তৃণখণ্ডের ন্যায় কেবল এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানগরিমা, তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা, তাঁহার অপরিসীম মানসিক শক্তি, কিছুতেই তাহাকে শান্তির অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পারে না। প্রতিভার

তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর প্রদীপ্ত থাকিতে পারে; কিন্তু শান্তির অভাবে তাঁহার স্থিরতা ঘটিতে পারে না। তাঁহার মনোমন্দিরের এক দিকে যেমন উজ্জ্বল আলোক; অপর দিকে সেইরূপ ঘোর অন্ধকার। তিনি আলোকের সাহায্যে অতীত ও বর্ত্তমান কালের মনীষীদিগের মানসপট সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে পারেন; কিন্তু উহা তাঁহার চিরাভীষ্ট রত্নের অন্বেষণে সহায় হইতে পারে না। বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তির পথ তাঁহার সমক্ষে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। তাঁহার মনোমন্দিরের উজ্জ্বল আলোক এই অন্ধকারভেদে সমর্থ হয় না। তিনি মানসিক শক্তিতে অপরাজেয় হইয়াও, হৃদয়ের শক্তির অভাবে ঐ অন্ধকারস্তূপে নিমজ্জিত থাকেন। অপরে তাঁহার মানসক্ষেত্রের আলোকে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাতে যেমন প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়, তাঁহার হৃদয়ের গভীর অন্ধকারে সেইরূপ বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া, তদীয় সত্ত্বগুণময় ধর্ম্মভাবের অভাব জন্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। লোকসমাজে তাঁহার প্রশংসালাভ হয়, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে লোকের হৃদয়গত শ্রদ্ধালাভ ঘটিয়া উঠে না। তিনি মানসিক আলোকের অধিকারী হইলেও, হৃদয়ের গভীর তমঃসাগরে নিমগ্ন হইয়া, অন্তিম কাল পর্য্যন্ত কেবল "জ্যোতিঃ আরও জ্যোতিঃ" বলিয়া কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়া থাকেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মানসক্ষেত্র এইরূপ সমুজ্জ্বল আলোক এবং এইরূপ গভীর অন্ধকারের বিকাশস্থল ছিল। পৃথিবীতে লোকে যাহা পাইলে আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে, মধুসূদনে তাহার অভাব ছিল না। মধুসূদন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের পুত্র। তাঁহার পিতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। তাঁহার মাতা একজন ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীর কন্যা। তাঁহার সংসারে কখনও কোনও বিষয়ের অভাব ছিল না। তিনি যেরূপ সবল ও সুস্থ, সেইরূপ বুদ্ধিমান্, মেধাবী ও শ্রমশীল ছিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, জ্যোতির্ম্ময় আয়ত

লোচনযুগল, উন্নত নাসিকা, কুঞ্চিত কেশ, সুনিপুণ চিত্রকর বা সুদক্ষ ভাস্করের গুণগৌরব প্রকাশের বিষয়ীভূত ছিল। তাঁহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তি—তাঁহার স্নেহ, দয়া, পরোপকার একজন ভাবুক কবির ভাবময়ী কবিতার অযোগ্য উপাদান ছিল না। কিন্তু কোমল বৃত্তির পার্শ্বে যে নিবিড় কালিমা ছিল, তাহা দেখিলে পথের একজন ভিক্ষুকও ঘৃণায় ও লজ্জায় মুখ বিকৃত এবং নাসিকা সঙ্কুচিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নির্ম্মল কোমল ভাবের পার্শ্বে এইরূপ ঘৃণিত পঙ্কিলভাব, উজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে এইরূপ গভীর অন্ধকারের অস্তিত্ব যে, নিরতিশয় বিস্ময়জনক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদনে এইরূপ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত, বিস্ময়াবহ ব্যাপারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঘটনা যেরূপ বিস্ময়াবহ, সেইরূপ শোকোদ্দীপক। কিন্তু যখন মধুসূদনের বাল্যকালের শিক্ষা, উচ্ছৃঙ্খলভাব, বিজাতীয় রীতি ও বিজাতীয় ভাবের অনুকরণপ্রবৃত্তি মনে হয়, তাঁহার সংযমশিক্ষায় তদীয় মাতাপিতার ঔদাস্য ও অযত্ন যখন স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে, তখন বিস্ময়ের আবেশ মন্দীভূত হয় বটে, কিন্তু শোকের উচ্ছ্বাস কখনও অল্প হয় না। মাতৃভাষানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিগণ চিরকাল মাতৃভাষার সেবক প্রতিভাশালী কবির জন্য শোকাশ্রুপাত করিবেন।

মধুসূদন সপ্তম বর্ষ বয়সে স্বকীয় আবাসপল্লী সাগরদাঁড়ীতে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বালকদিগের ভীতিস্থল ছিল। যখন বেত্রধারী গুরুর ভীষণমূর্ত্তি তাহাদের মনে উদিত হইত, তখনই তাহারা আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিত। তাহারা গুরুকে শিক্ষাদাতা বলিয়া যত ভক্তি করুক বা নাই করুক, যমদূত বলিয়া শতগুণে ভয় করিত। অনেকে এই যমদূতের ভয়ে আত্মগোপন করিত। অনেকেই ইঁহার প্রসন্নতাবিধান জন্য নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য আনিয়া দিত। অনেকে ইঁহার ভীষণ আক্রমণ

হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, বালক হইয়াও তোষামোদকারী বাক্‌চতুরের ন্যায় অলীক স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু মধুসূদন কখনও গুরুকে যমদূত বলিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করেন নাই। তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির একমাত্র পুত্র; স্নেহপরায়ণা জননীর অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতির অদ্বিতীয় অবলম্বন। দাস-দাসীগণ নিরন্তর তাঁহার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিত। পিতৃগৃহের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নিরন্তর সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য যত্ন প্রকাশ করিত। তাঁহার পিতা এই সময়ে ওকালতীর জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি সাগরদাঁড়ীর বাড়ীতে থাকিয়া, লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী হইলেও, মাতা স্নেহাতিশয্যপ্রযুক্ত তাঁহাকে কোন কথা বলিতেন না। কিন্তু মধুসূদন লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছিলেন না। গুরুমহাশয়ের বেত্রে তিনি দৃক্‌পাত করিতেন না। অপর বালকেরা যে স্থানে যাইতে ভীত হইত, তিনি প্রফুল্লভাবে সেই স্থানে গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি চিরকালই বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী পাঠে জানা যায় যে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তিনি সমুদয় বিঘ্নবিপত্তিকে পদদলিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। লোকপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের সমকক্ষ হইবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। এই প্রবল বাসনাস্রোত কিছুতেই নিরুদ্ধ হয় নাই। বাল্যকালে ইহার রেখামাত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। যৌবনে ইহা প্রসারিত হইয়া, তাঁহাকে বিবিধ ভাষার অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। যাহারা সংসারে অভীষ্ট ফললাভের জন্য অটলভাবে বিঘ্ন-বিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, শৈশবেই তাঁহাদের চরিত্রে সেই অটলতার নিদর্শন লক্ষিত হইয়া থাকে। রাজপুতবীর শক্ত যখন একখানি নবনির্ম্মিত তরবারির ধার পরীক্ষা করিবার জন্য অম্লান-ভাবে আপনার অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া উহাতে আঘাত করিয়াছিলেন,

তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসরের অধিক ছিল না। পঞ্চমবর্ষীয় বালক যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, সেই তেজস্বিতাই অতঃপর তাঁহাকে গরীয়সী জন্মভূমির গৌরব রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। শক্ত ভ্রাতৃদ্রোহী হইলেও, চিরস্মরণীয় হলদিঘাটের যুদ্ধের পর জ্যেষ্ঠের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া, কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মধুসূদন অতঃপর যে মানসিক শক্তিতে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন, সপ্তমবর্ষ বয়সেই তাঁহাতে সেই শক্তির অঙ্কুর পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু শক্ত তেজস্বী বীরের চিরাভ্যস্ত গুণের অবমাননা করেন নাই। মধুসূদন পণ্ডিতোচিত ধীরতার অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদ্রোহী ও মাতৃদ্রোহী হইয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; জনকজননীর সেই বাৎসল্য, সেই স্নেহপ্রবণতা, সেই শোকাশ্রু মনে করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে তাঁহাদের পদপ্রান্তে দণ্ডায়মান হয়েন নাই, বা তাঁহাদের হৃদয়গত জ্বালা দূর করিবার জন্য কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। রাজপুত চিরকাল বীরধর্ম্মে অভ্যস্ত; আজন্ম বীরব্রতের সম্মান-রক্ষায় কৃতহস্ত। মতিভ্রমপ্রযুক্তই হউক, ক্রোধের উত্তেজনাতেই হউক, হিংসার আবেগেই হউক, রাজপুত অবলম্বিত পথে স্খলিতপদ হইলেও, আপনার সেই চিরন্তন নীতি, সেই মহীয়সী শিক্ষা একবারে বিসর্জ্জন দেয় না। শক্ত এই শিক্ষার গুণেই বীরত্বের সম্মানরক্ষার জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের পদানত হইয়াছিলেন। আর মধুসূদন? মধুসূদনের অদৃষ্টে এরূপ শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই। অশ্ব যেমন অসংযত হইলে অপথে ধাবিত হয়, মধুসূদনও সেইরূপ অসংযত হইয়া, বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য একজন পরিচালকও আবির্ভূত হয়েন নাই। তাঁহাকে সংযতভাবে রাখিবার জন্য একজন শিক্ষাদাতাও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই!

মধুসূদন মানসিক শিক্ষার অসামান্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন

তিনি ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। ইংরেজ অধ্যাপকের প্রদত্ত শিক্ষায় ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। তিনি ইংরেজী রচনায় অভ্যস্ত, ইংরেজীতে কথোপকথনে সুদক্ষ এবং ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের ভাবগ্রহণে সুনিপুণ হয়েন; তিনি বাল্যকাল হইতেই কবিতার আদর করিতেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত কবিতার প্রতি তদীয় অনুরাগ ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। ইংরেজী ভাষায় অধিকার লাভ করিয়া তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া আমোদিত হইতেন। ইংরেজ কবিদিগের কাব্যপাঠে তাঁহার তৃপ্তি লাভ হইত। ইংরেজ দার্শনিক ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁহার দূরদর্শিতাবৃদ্ধির সহায় হইতেন। কিন্তু ইংরেজ অধ্যাপকের উপদেশে, ইংরেজ গ্রন্থকারদিগের রচনাপাঠে, তিনি বহুদর্শী হইলেও হৃদয়ের ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারেন নাই। তাঁহার মনের শিক্ষা যথোচিত হইয়াছিল, হৃদয়ের শিক্ষা কিছুই হয় নাই। তিনি পাশ্চাত্য কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কাব্য তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হয় নাই। মিল্টন্ তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন; তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেন; তাঁহার রচনাশক্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া দিতেন। কিন্তু মিল্টনের ধর্ম্মভাবে তাঁহার ধর্ম্মভাব উন্নত হয় নাই; মিল্টনের চিত্তসংযমে তাঁহার চিত্তসংযম ঘটে নাই। পাপবৃত্তির প্রতি মিল্টনের বিদ্বেষভাবও তাঁহাকে পাপের প্রতি বিদ্বেষপ্রদর্শনে প্রবর্ত্তিত করে নাই। মিল্টন্ যেরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনিও সেইরূপ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা যেমন বলবতী, তাঁহার সাধনাও সেইরূপ মহীয়সী ছিল। তিনি সাধনাবলে ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। আটটি প্রধান ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি এক দিকে যেমন বাঙ্গালা, সংস্কৃত, তেলেগু প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষার আলোচনা করিতেন, অপরদিকে সেইরূপ হিব্রু, গ্রীক্, লাতিন্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মান্,

ইতালীয় প্রভৃতি আধুনিক ইয়ুরোপীয় ভাষার অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। যিনি এইরূপ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম স্থানে আরোহণ করিয়াছেন; অধ্যবসায় প্রভাবে যিনি ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাষার কবিদিগের ললিতপদাবলী, উদ্দীপনাময়ী কবিতামালা, স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিয়াছেন; তিনি কি জন্য হৃদয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হইলেন? কোমল ভাব যাঁহাদের রচনার প্রধান উপকরণ; দয়াধর্ম্ম যাঁহাদের কল্পনার প্রধান সহায়; পাপীর দুর্ভাগ্য, ধার্ম্মিকের সৌভাগ্য, যাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়; তাঁহাদের সহিত চিরপরিচিত হইয়া বিনীতভাবে তাঁহাদের পদপ্রান্তে অবনত থাকিয়া এবং তাঁহাদের কাব্যপাঠে অবকাশকাল অতিবাহিত করিয়া, তিনি কি জন্য পাপপঙ্কে কলুষিত হইলেন? কি জন্য ধর্ম্মভাব বিসর্জ্জন দিয়া, আপাতরম্য বিষয়বাসনার পঙ্কিল প্রবাহে ভাসমান হইলেন? কি জন্য স্নেহশীল জনক, বাৎসল্যময়ী জননী, প্রীতিভাজন পরিজনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন? কি জন্য পরকীয় বেশে সজ্জিত, পরকীয় রীতিতে পরিচালিত, পরকীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া, পরদেশে জীবনযাপনে অগ্রসর হইলেন? তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহার শিক্ষার দোষই প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষাদোষে তাঁহার চরিত্র বিকৃত হইতে পারে; শিক্ষাদোষে তিনি অপথে পদার্পণ করিতে পারেন; শিক্ষাদোষে তিনি বিজাতীয় ভাবে বিমোহিত হইয়া, জাতীয় ভাব বিসর্জ্জন দিতে পারেন; কিন্তু বোধ হয়, কেবল শিক্ষার ব্যভিচারই এরূপ বিসদৃশ ঘটনার একমাত্র কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অপশিক্ষার সহিত মাতাপিতার অযত্ন এবং অত্যধিক সন্তানবাৎসল্য-প্রযুক্ত অত্যাদরই মধুসূদনকে অপথে পরিচালিত করিয়াছিল। হিন্দুকলেজে

মধুসূদনের অনেক সতীর্থ ছিলেন; ইঁহারাও কার্য্যক্ষমতায়, পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিগুণে সমাজে যথোচিত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় ইঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে নাই। ইঁহারা সকলেই এক গুরুর নিকটে এক শ্রেণীতে উপবিষ্ট হইতেন; এক গুরুর মুখে উপদেশ শুনিতেন; এক গুরুর ব্যাখ্যায় সন্দেহ দূর করিতেন; এক গুরুর সমক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধির পরিমাণ করিতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ইঁহাদের সকলের সমক্ষেই প্রসারিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার নিদর্শন সকলেই সমভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য রীতিনীতি সকলেরই আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন ঐ জ্ঞানালোকে যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত, ঐ সভ্যতায় যেরূপ আকৃষ্ট, ঐ রীতিনীতিতে যেরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, অপরে সেরূপ হয়েন নাই। মধুসূদন যে পথ অবলম্বন করেন, অপরে উহার বিপরীতপথগামী হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মধুসূদন যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা মানসিক উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইলেও হৃদয়ের উন্নতির পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু একই শিক্ষায় যে, একই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে ফলের ইতর-বিশেষ ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। মধুসূদন যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া, উন্মার্গগামী হইয়াছিলেন; মধুসূদনের সহাধ্যায়ী ভূদেব তাহার আকর্ষণে স্খলিতপদ হয়েন নাই। মধুসূদন জাতীয় ভাব পদদলিত করিয়াছেন; ভূদেব জাতীয় ভাবের প্রাধান্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। একের প্রতিভা বিজাতীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বদেশের চিরারাধ্য, চিরপ্রসিদ্ধ চরিত্রের হীনতা ঘটাইয়াছে; অপরের প্রতিভা স্বদেশের বিশ্বজনীন, উদার ভাবনিচয়ের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। মধুসূদন যদি পিতার নিকটে অত্যধিক আদর না পাইতেন, মাতার নিকটে যদি অত্যধিক বাৎসল্যের ফলভোগ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার উদ্দাম

প্রকৃতি কিয়দংশে সংযত থাকিত। তিনি বাল্যকালে মাতৃসমীপে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিতেন ; কবিকঙ্কণের অমৃতময়ী কবিতায় আমোদিত হইতেন ; কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের মহত্ত্ব, চণ্ডীর জাতীয় ভাবমূলক স্বাভাবিক বর্ণনা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। তাঁহার মাতা তাঁহাকে হিন্দুত্বের মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর করিতে যত্নবতী হয়েন নাই। তিনি মাতার নিকটে যাহার আবদার করিয়াছেন ; মাতা, তাঁহার সন্তোষসাধন জন্য তাঁহাকে তাহাই দিয়াছেন। কিসে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলভাব দূরীভূত হইবে, কিসে তিনি সংযতচিত্ত হইবেন, কিসে স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া, তিনি জাতীয় ভাবের জয় কীর্ত্তন করিবেন ; তাঁহার পিতা কি মাতা, তৎপ্রতি মনোযোগী হয়েন নাই। এই অমনোযোগপ্রযুক্ত মধুসূদন অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হয়েন। পাশ্চাত্যভাব তাঁহাকে যে দিকে টানিতেছিল, তিনি বিনা বাধায় সেই দিকে ধাবিত হয়েন। এইরূপে তাঁহার অধঃ-পতনের সূত্রপাত হয়। এইরূপে তাঁহার অদৃষ্টচক্র নিম্নাভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তাঁহার অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় অবস্থা তাঁহাকে সর্ব্বাংশে আয়ত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে। মধুসূদন মাতাপিতার আদরের ধন হইলেও পরিশেষে তাঁহাদের ত্যাজ্য পুত্রের মধ্যে পরিগণিত হয়েন। তিনি স্নেহময়ী জননীর যেরূপ ত্যাজ্য পুত্র, গরীয়সী জন্মভূমিরও সেইরূপ অধঃপতিত, প্রনষ্টসর্ব্বস্ব, অবোধ সন্তান। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে যেমন সকলের বরণীয় করিয়া রাখিবে, তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিও সেইরূপ তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয়গণের নিকটে অদূর-দর্শী ও অব্যবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে।

যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী হইয়াও, আপনাদের প্রতিভায় জগতের সমক্ষে অসামান্য প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা বিবেক হইতে বিচ্যুত হইলেও, লোকসমাজে উদারতা ও মহানুভাবতার পরিচয়

দিতে বিমুখ হয়েন নাই। তাঁহাদের দয়া, তাঁহাদের কোমলতা, তাঁহাদের উদারতা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন সকল স্থলেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা প্রকৃতির অধঃপতিত সন্তান, কিন্তু এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনেও প্রকৃতি তাঁহাদের মানসমন্দিরে কোমল ভাব প্রকাশ করিতে নিরস্ত হয় নাই। তাঁহাদের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি তাঁহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্ত্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও, অপরের সমক্ষে তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। তাঁহারা স্বয়ং অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েন; সমাজের উন্নত স্তর হইতে নিরতিশয় নিম্ন স্তরে পতিত হইয়া থাকেন; সৌভাগ্যসূর্য্যের উদ্দীপ্ত আলোক হইতে ঘোরতর দুর্ভাগ্যতমঃ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। সেই শোচনীয় অধঃপতন, সেই অভাবনীয় অবনতি এবং সেই ঘোরতর দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে এরূপ স্নিগ্ধ মহত্ত্বজ্যোতিঃ নিঃসৃত হয় যে, লোকে উহার প্রশান্ত ভাবে বিমোহিত হইয়া থাকে। গোল্ডস্মিথ্ প্রকৃতির দূরদৃষ্ট সন্তানের মধ্যেই পরিগণিত ছিলেন। তিনি মানসিক শিক্ষার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; আপনার অভাব মোচনের জন্য বিষয়কর্ম্মের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রযুক্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তিনি এক দিন সুখসেব্য বিষয়ে পরিতৃপ্ত, অন্য দিন উদরান্নের জন্য লালায়িত; এক দিন সুদৃশ্য পরিচ্ছদে সুশোভিত, অন্য দিন মলিনবসনে গৃহস্থের সমক্ষে দরিদ্র ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত; এক দিন বিষয়কর্ম্মে নিয়োজিত, অন্য দিন কপর্দ্দকশূন্য হইয়া, নিরতিশয় দুর্দ্দশায় নিপতিত। তিনি শিক্ষিত হইয়াও এইরূপে বিবেকের সম্মান রক্ষা করিতেন! তাঁহার হৃদয়াকাশে এক মুহূর্ত্ত যেরূপ সৌদামিনীর সমুজ্জ্বল প্রভার বিকাশ হইত, পরমুহূর্ত্তে সেইরূপ ঘোরতর অন্ধকারের আবির্ভাব ঘটিত। কিন্তু

তিনি এইরূপ অব্যবস্থিত ও অধঃপতিত হইলেও হৃদয়গত, কোমলভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রসময়ী কবিতায় তদীয় কোমল বৃত্তিগুলি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি অর্থ পাইলে পরদুঃখমোচনের জন্য মুক্তহস্তে দান করিতেন; পর দিনে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে, এ ভাবনা তদীয় মনোমধ্যে স্থান পাইত না। এইরূপে তিনি একদিন দানশীল, অন্য দিন ভিক্ষাপ্রার্থী ছিলেন। মধুসূদনেরও এইরূপ দান-শীলতা ছিল। নিজের অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, মধুসূদন সর্ব্বদা পরকষ্টমোচনে উদ্যত থাকিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার সমক্ষে শত্রুমিত্রের পার্থক্য ছিল না। স্বদেশভক্তিতে, হৃদয়ের কোমলভাবে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে তিনি গোল্ডস্মিথ্‌কেও অতিক্রম করিয়াছেন। গোল্ডস্মিথ্‌ যেখানে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেন, মধুসূদন সেখানে কৃতজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উভয়ের কবিতাই স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম একদিকে যেমন প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ উজ্জ্বলভাবের পরিচয় দিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ জাহ্নবীর জলধারার ন্যায় অসামান্য স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, লোকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিতেছে। মধুসূদন যখন ইয়ুরোপে যাত্রা করেন, তখন তিনি জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ;
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ—
মধুহীন ক'র না গো তব মনঃকোকনদে।"

গরীয়সী জন্মভূমির প্রতি তাঁহার এইরূপ ভক্তি, এইরূপ প্রীতি, এইরূপ অনুরাগ কখনও মন্দীভূত হয় নাই। তিনি ইয়ুরোপে গিয়াছেন। ইয়ুরোপের বিভিন্ন জনপদের প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহার সমক্ষে সৌন্দর্য্য-

গৌরবের পরিচয় দিয়াছে। ইয়ুরোপের কবিকুল কবিত্বসুধায় তাঁহারা তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সকলের মধ্যেও স্বদেশের বিষয় বিস্মৃত হয়েন নাই। স্বদেশের সহিত, আত্মীয় স্বজনের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ স্বদেশের কথাই জাগরূক রহিয়াছে। বিদেশের তরঙ্গিণীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, তিনি জন্মভূমির কপোতাক্ষ নদের বিষয় ভাবিয়া, নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। দান্তে, হ্যুগো প্রভৃতির ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া, তিনি বাল্মীকি, কালিদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস প্রভৃতির নিকটে যথোচিত ভক্তিসহকারে অবনতমস্তক হইয়াছেন। আর যাঁহার সাহায্যে তিনি সেই সুদূর দেশে, সেই অপরিচিত স্থানে অর্থাভাবজনিত দুঃসহ কষ্ট দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যিনি করুণাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে অর্দ্ধাশন বা অনশন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়াছে। তিনি কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বিভোর হইয়া, সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে লিখিয়াছেন—

> "বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে;
> দীন যে, দীনের বন্ধু।"

ফলতঃ ইয়ুরোপে প্রবাসকালে মধুসূদন যেন সর্ব্বাংশে জাতীয়ভাবে সঞ্জীবিত হইয়াছিলেন। তিনি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপঞ্চমী, দেবদোল, আশ্বিন মাসে বাঙ্গালীর মহোৎসবের কথা তাঁহার হৃদয়কে যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত করিত। পরদেশে বাস করিলেও তিনি স্বদেশের বিষয় বর্ণনায় আমোদিত হইতেন। পরকীয় ভাষা—পরকীয় সাহিত্যের অনুশীলন করিলেও, তিনি বঙ্গভাষাকে লক্ষ্য করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে গাইতেন—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

ইয়ুরোপে মধুসূদন এইরূপ অনুতপ্তহৃদয়ে স্বদেশের জন্য, স্বদেশীয় বিষয়ের নিমিত্ত অনুক্ষণ শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। স্বদেশে তাঁহার শান্তিলাভ হয় নাই। তিনি স্বদেশে থাকিতে নৈরাশ্যে অধীর হইয়া গাইয়াছিলেন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় !
তাই ভাবি মনে !
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না এ কি দায় !"

বিদেশেও তাঁহার অদৃষ্টে এইরূপ অশান্তি, এইরূপ নৈরাশ্য ঘটিয়াছিল। বিশ্বসংসার যেন তাঁহার সমক্ষে মহামরুভূমির মত ছিল। মরুভূমধ্যে তৃষ্ণাকাতর পান্থ যেমন মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তিনিও সেইরূপ শান্তির আশায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে সংসার-মরুতে বিচরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। যে সকল গুণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের সহায়, তাঁহার হৃদয়ে সেই সকল গুণের অভাব ছিল না। শিক্ষা, সংসর্গ ও পরিণামদর্শিতা অনুকূল হইলে, ঐ সকল গুণ সর্ব্বাংশে প্রকট হইয়া, তাঁহাকে সকল বিষয়ে সাধারণের বরণীয় করিয়া তুলিত। কিন্তু তমোগুণের প্রতিকূলতায় অন্ধকারময় খনির মধ্যস্থ রত্নের ন্যায় তাঁহাতে ঐ সকল গুণের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হইত না। এক একবার যখন অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, তখনই ঐ সকল গুণের

বিকাশ হইত; এবং তখনই ঐ সকল গুণ তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয়স্থল হইয়া উঠিত। তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে যে সদ্‌গুণবীজ রোপিত ছিল, তাহার অঙ্কুরোদ্গম হইলেও, সেই অঙ্কুর যথাকালে পরিবর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন হইতে পারে নাই।

সংসারক্ষেত্রে মধুসূদন এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে অতৃপ্ত, সকল সময়ে অনুতাপদগ্ধ ও সর্ব্বস্থলে অশান্তিতে অবসন্ন পুরুষ। কিন্তু কাব্যজগতে তিনি অমৃতময়ী বাগ্দেবীর পরম স্নেহাস্পদ পুত্র এবং সহৃদয়সমাজে তিনি অসামান্যপ্রতিভাসম্পন্ন, অসীম ক্ষমতাশালী, মহাকবি। সমাজের আদিম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই কল্পনাপ্রিয় হইয়া থাকে। বেগবতী তরঙ্গিণী, সমুন্নত পর্ব্বত, সুচ্ছায় বৃক্ষ, অনন্ত নীল আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন একদিকে তাঁহার কল্পনার লীলাস্থল হয়, মহত্তর বা নিকৃষ্টতর মানবচরিত্রও সেইরূপ তাঁহার রসময়ী কবিতার বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় কবিতা প্রায়ই উদ্ভাবনা, উদ্দীপনা প্রভৃতি গুণে উৎকর্ষ লাভ করে। উহা বিমল স্রোতস্বতীর ন্যায় যেরূপ প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ আবেগময় হইয়া থাকে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি উন্নতি লাভ করে বটে, কিন্তু সভ্যতাবৃদ্ধিতে অনেক সময়ে কাব্যের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয় না। সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থাতেই কবিতার সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। বাল্মীকি বা হোমর যাহা দেখেন নাই, কল্পনাবলে যাহা ভাবিতে পারেন নাই, বৈজ্ঞানিক ও গণিতজ্ঞের ক্ষমতায় তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে; কিন্তু বাল্মীকি বা হোমর কাব্যজগতে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। সভ্যতার আদিম অবস্থা মানুষকে অধিকতর সরল এবং তাহার ভাষাকে অধিকতর কবিত্বময় করে। কোমলমতি বালক যখন নীতিশিক্ষার জন্য হিতোপদেশে পথিক ও ব্যাঘ্রের কথা পাঠ করে, তখন ব্যাঘ্রের সেই ভয়ঙ্কর ভাব, সেই বলবতী

জীবহিংসাপ্রবৃত্তি তাহার স্মৃতিপটে নিরন্তর জাগরূক থাকে। ব্যাঘ্র নিরন্তর তাহার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিতে থাকে, তাহার বাসগ্রামে ব্যাঘ্র না থাকিলেও, এবং সে উহার ভীষণ মূর্ত্তির সহিত পরিচিত না হইলেও, সর্ব্বদাই তাহার মনে হয়, ব্যাঘ্র যেন মুখ ব্যাদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শিশু যেমন কল্পনাতরঙ্গে আন্দোলিত হয়, সভ্যতার আদিম অবস্থায় কোমলমতি মানুষও সেইরূপ কল্পনাস্রোতে ভাসমান হইয়া থাকে। তখন তাহার হৃদয় যেন কাব্যরসের অক্ষয় আধারস্বরূপ হইয়া উঠে। মানুষ সভ্যতার দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার চিন্তাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকভাব বৃদ্ধি হয়, এবং কবিত্বসুলভ পূর্ব্বতন কল্পনার উচ্ছ্বাস তাহার নিকট হইতে দূরীভূত হইতে থাকে। তখন সে সরলহৃদয় ভাবুক না হইয়া, প্রগাঢ় চিন্তাশীল দার্শনিক হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সভ্যতার আদিম অবস্থায় মানুষের মনোগত ভাবপ্রকাশক ভাষা যেমন কবিত্বের উপাদানে সংগঠিত হয়, সভ্যতার অবস্থায় তাহার ভাষা সেইরূপ বিচারচাতুর্য্যময় দার্শনিক ভাবে জড়িত হইয়া উঠে।

কিন্তু আদিম অবস্থায় সকলেই প্রকৃত কবিত্বের অধিকারী হইতে পারে না। প্রতিভা সকলকে কাব্যজগতের আধিপত্য প্রদান করে না। অধিকন্তু যত্ন করিলে বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র লোকের আয়ত্ত হয়। যত্নাতিশয়ে কবিত্ব সকলের অধিকৃত হয় না। একজন গণিত ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া নিউটন বা ফ্যারাডের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন; কিন্তু এক ব্যক্তি আজন্ম কাব্যোদ্যানের ভাবকুসুম-রাশির চয়নে ব্যাপৃত থাকিলেও শেক্ষপীয়র হইতে পারেন না। কবি মানুষের মনোগত ভাবের সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন; সমাজের উত্থান ও পতনের বিবরণ বিশদ করিয়া দিতে পারেন। একটি দার্শনিক বা বিজ্ঞানবিৎ কবির ন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। কালিদাস

ইচ্ছা করিলে সাংখ্যকারের ন্যায় দার্শনিক বিচারে পটুতা দেখাইতে পারিতেন; কপিল ইচ্ছা করিলে বোধ হয়, একটি দুষ্মন্ত বা একটি শকুন্তলার সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় কবিত্বের বিকাশ হয়; কিন্তু সকলেই এই অসামান্য ও অতুল্য ক্ষমতাপ্রদর্শনে সমর্থ হয় না। আদিম অবস্থায় মানুষের ভাষা কবিত্বময় হইলেও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাই প্রকৃত কবি বলিয়া সম্মানিত হয়েন। কবি লোকের সমক্ষে মায়া বিস্তার করেন। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক ছায়াবাজির সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। অন্ধকারময় গৃহে ছায়াবাজি যেমন দর্শকের সমক্ষে নানা দৃশ্য বিস্তার করে, অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে কবিতাও সেইরূপ মায়া দেখাইয়া, লোকের হৃদয় উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। আলোকের সঞ্চারে ছায়াবাজির কৌশল যেমন ক্রমে অন্তর্হিত হয়, সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কাব্যজগতের সেই চিত্তবিমোহিনী মায়াও সেইরূপ অপগত হইতে থাকে। কবিতা মানুষের অনুন্নত অবস্থাতে অধিকতর কোমল, অধিকতর সরল ও অধিকতর চিত্তবিভ্রমকর হইয়া থাকে।

কিন্তু সভ্যতার অপূর্ণ অবস্থায় উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইলেও যে, সভ্যতার পূর্ণ অবস্থায় কবিতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না, এমন নহে। আদিম অবস্থায় মানব অধিকতর সরলপ্রকৃতি ও কল্পনাপ্রিয় হওয়াতেই বোধ হয়, সাধারণতঃ এই সংস্কার জন্মে যে, অনুন্নত যুগে উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হয়। প্রতিভা সহায় হইলে, মানব উন্নত অবস্থাতেও কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় দিতে পারে। সভ্যযুগে এমন অনেক কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তৎসমুদয় অদ্যাপি সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, এবং যাঁহাদের প্রতিভাগুণে সেই সকল কাব্য পাঠকের হৃদয় অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছে, তাঁহারা অদ্যাপি সমগ্র কবিসমাজে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। মিল্টনের ন্যায় কোন কবি সহৃদয়সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু

সভ্যতার আদিম অবস্থায় মিল্টনের আবির্ভাব হয় নাই। মিল্টন সভ্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার সুশিক্ষালাভ হইয়াছিল। লাতিনে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি ইয়ুরোপের নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া, দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনপদের পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ করিয়া, সংগৃহীত জ্ঞানের সম্প্রসারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপের প্রচলিত ভাষায় তাঁহার যথোচিত অধিকার ছিল। তিনি দার্শনিকভাবে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; দার্শনিক ভাবে তৎসমুদয়ের আলোচনা করিতেন; দার্শনিক তত্ত্বের সহিত দুরবগাহ রাজনীতির পরিচয় দিয়া, লোকের হৃদয় চমকিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপ সুশিক্ষায়, রাজনীতি ও দার্শনিক ভাবের এইরূপ জটিলতায় মিল্টনের প্রতিভা সঙ্কুচিত হয় নাই। মিল্টন্ যে মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমগ্র কাব্যজগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মধুসূদন যে সময়ে আবির্ভূত হয়েন, সে সময়ে সভ্যালোক যেরূপ উদ্দীপিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিও সেইরূপ উন্নত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এদিকে মধুসূদন নানা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, নানা বিষয় দেখিয়া, বহুদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সভ্যতার অবস্থায় তাঁহার রসময়ী লেখনী হইতে যে কাব্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারে প্রাধান্য রক্ষা করিতেছে। মিল্টন্ কেবল মহাকাব্য প্রণয়নপূর্ব্বক চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। সাহিত্যক্ষেত্রের পঙ্কিলভাব দূর করিয়াও তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। যখন তাঁহার আবির্ভাব হয়, তখন ইংলণ্ডে তাদৃশ সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল না। দুর্নিবার্য্য পাপস্রোত শৃঙ্খলার ঐ মূলদেশ ক্রমে ক্ষয় করিয়া তুলিতেছিল। রাজা ভোগাভিলাষী হইয়া, অপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেছিলেন। পারিষদগণ বিলাসসুখে প্রমত্ত হইয়া, অবৈধ কার্য্যের

অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। বিলাসিনী ললনাদিগের মধ্যে সুনীতিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। এইরূপ ভোগাভিলাষের বৃদ্ধির জন্য, এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল সমাজের সন্তোষসম্পাদন এবং এইরূপ বিলাসীদিগের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ প্রণীত ও প্রচলিত হইত, তৎসমুদয়ের সহিত বিশুদ্ধ ভাবের সংস্রব থাকিত না। গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা নির্গত হইত। নাট্যশালায়, সঙ্গীতে, কবিতায়, সর্ব্বত্রই এই তীব্র হলাহলস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইত। পিউরিটন্ সম্প্রদায় সুনীতির সম্মানরক্ষার জন্য এই স্রোতের গতি নিরুদ্ধ করিতে উদ্যত হয়েন। ঐ সম্প্রদায়ের পরিপোষক মিল্টন উক্ত কুনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া গম্ভীরভাবে, গম্ভীর ভাষায় যে মহাকাব্য প্রণয়ন করেন, তাহা ইংলণ্ডকে শতগুণে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। তাঁহার প্রতিভায় সাহিত্যের পঙ্কিলভাব দূরীভূত হয়। ভাবগাম্ভীর্য্যে, রচনাচাতুর্য্যে ও সুনীতিগৌরবে মিল্টনের কাব্য ইংরেজী সাহিত্যে সর্ব্বাংশে প্রাধান্য লাভ করে। এদিকে মধুসূদনের সময়ে বাঙ্গালা কবিতায় তাদৃশ গাম্ভীর্য্য ছিল না। অনেক সময়ে উহাতে সুরুচির অবমাননা ঘটিত। ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করের কবিতাযুদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যে নিরতিশয় অপকৃষ্ট ঘটনার মধ্যেই পরিগণিত রহিয়াছে। এই সকল কবিতা এরূপ পঙ্কিল ভাবে পরিপূর্ণ যে, উহাতে নয়নাবর্ত্তন করিলেও ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিতে হয়। ঈদৃশ পঙ্কিল ভাব কেবল ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করেই আবদ্ধ থাকে নাই। ইঁহাদের অনুকরণকারী লেখকগণ গুণাংশের অনুকরণে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহারা নিরতিশয় নিন্দনীয় বিষয়ের অনুকরণ করিতেন। সুতরাং অনুকরণের হীনতায় তাঁহাদের লেখনী হইতে এরূপ অপকৃষ্ট রচনা নির্গত হইত যে, তাহা ভদ্রসমাজের অপাঠ্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, অপকৃষ্ট লেখকগণ তাহার অধিকারী হইতে না পারিয়া, আপনাদের

রচনা পঙ্কিলভাবে অস্পৃশ্য করিয়া তুলিতেন * এই পঙ্কের মধ্যে রঙ্গলালের পদ্মিনীর যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়, তাহা অনাবিলভাবে সহৃদয়দিগের প্রীতি বর্দ্ধন করে। বাঙ্গালা কবিতার অনাবিলভাব মধুসূদনের প্রতিভায় অধিকতর পরিশুদ্ধ হয়। যে আলোক স্তিমিতভাবে ছিল, মধুসূদনের ক্ষমতায় তাহা প্রদীপ্ত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য সমুজ্জ্বল করে।

মধুসূদনের প্রতিভায় জাতীয় সাহিত্য সমুজ্জ্বল এবং মধুসূদনের ক্ষমতায় জাতীয় সাহিত্য অভিনব পথে পরিচালিত হইলেও, মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের সেবক ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহার উপর এমন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল যে, তিনি প্রথমে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। এক সময়ে মাতৃভাষায় ভালরূপে কথাবার্ত্তা কহিতেও তাঁহার কষ্ট হইত। তিনি পৃথিবীকে প্রথিবী বলিতেন। সাহেবী ভাবে তাঁহার মতির যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সেইরূপ আচারাদিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন পাশ্চাত্য ভাষার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেয় নাই। মান্দ্রাজে অবস্থিতিকালে তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরেজী কাব্য তদীয় প্রতিভার নিদর্শনস্বরূপ হইলেও, সাহিত্যসমাজে তাঁহার

* ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে অনেকে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া কবিসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, ইঁহারা এই উক্তির লক্ষ্য নহেন। যাঁহারা সংবাদপত্রে প্রভাকরের হীন অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত নানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অপকৃষ্ট। এই সময়ে "আকেল গুড়ুম" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার লিখন-ভঙ্গী দেখিয়া লোকের আকেল যথার্থই গুড়ুম হইত।" (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা)। ভাস্কর ও রসরাজের হীন অনুকরণে এই অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছিল।

প্রতিপত্তির কারণ হয় নাই। ক্যাপটিভ লেডি প্রভৃতির লেখক কথনও বঙ্গীয় সমাজে সুপরিচিত হইতে পারিতেন না এবং কথনও বোধ হয়, টেনিসন প্রভৃতির পার্শ্বে আসনপরিগ্রহে সমর্থ হইতেন না। বঙ্গভূমির সৌভাগ্যক্রমে মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়ার রঙ্গালয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভের যোগ্য। * এই রঙ্গালয় মধুসূদনকে বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবর্ত্তিত করে। এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার কোনরূপ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এ সময়ে তদীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে মাতৃভাষাদ্বেষী পুরা সাহেব বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহাদের সংশয়চ্ছেদন হয়। মধুসূদন কয়েকখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় যে নাটক প্রণয়ন করেন, সেই নাটক তাঁহার ভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে থাকে। ক্রমে "পদ্মাবতী" নাটক এবং দুইখানি প্রহসন প্রণীত হয়। নাটকে ও প্রহসনে তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইয়া উঠে। যিনি এত সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; বাঙ্গালায় চিঠিপত্র লিখিতে এবং বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জিত হইতেন; কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থ ভিন্ন যিনি অন্য কোনও বাঙ্গালা গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠ করিতেন না; তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহার শব্দযোজনার পারিপাট্য ও ভাবগাম্ভীর্য্য দেখিয়া, বাঙ্গালী পাঠকগণ সবিস্ময়ে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পূজায় অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালায় অনেক প্রহসন প্রণীত ও প্রকাশিত

* পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের বেলগাছিয়া স্থিত উদ্যানবাটীতে এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উহাতে প্রথমে রত্নাবলী নাটকের মধুসূদনকৃত ইংরেজী অনুবাদের অভিনয় হয়। মধুসূদন ইংরেজীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা নাটক অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গালায় নাটক লিখিতে উদ্যত হয়েন। ইরূপে তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক প্রণীত হয়।

হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের প্রহসনদ্বয় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গালা কবিতায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তনা মধুসূদনের প্রতিভার অসামান্য নিদর্শন। যখন তাঁহার "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রকাশিত হয়, তখন ঐ কাব্যের প্রতি অনেকেই উপেক্ষা দেখাইয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য ও দূরদর্শিতায় সমাজে যাঁহারা প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাঁহারাও মধুসূদনের অভিনব অমিত্রচ্ছন্দাত্মক কাব্যপাঠে সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে চিরদিনই বীরোচিত প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। শত তিরস্কারে, শত অখ্যাতিবাদে, শত দোষঘোষণায় তাহার বীরধর্ম্ম কখনও বিচলিত হয় নাই। তিনি যখন সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক প্রকাশ করেন, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ অলঙ্কারগত ও রচনাবিষয়ক নানা দোষের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি যখন অমিত্রচ্ছন্দে প্রথম কাব্য প্রণয়ন করেন, তখনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধে নানা কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় মধুসূদন উহাতে দৃক্‌পাত করেন নাই। তিনি ধীরভাবে এবং তেজস্বিতাসহকারে কাব্যে ও নাটকে আপনার অবলম্বিত রীতি রক্ষা করিতে থাকেন। ধীরতা, তেজস্বিতা ও বীরোচিত প্রকৃতির গুণে পরিশেষে মধুসূদন রণপারদর্শী, বিজয়ী যোদ্ধার ন্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরবান্বিত হয়েন। তাঁহার "কৃষ্ণকুমারী"তে তদীয় রচনানৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়। যাঁহারা এক সময়ে "শর্ম্মিষ্ঠা" পড়িয়া মধুসূদনের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহারা "কৃষ্ণকুমারী" পড়িয়া, তাঁহার প্রশংসাবাদে অগ্রসর হয়েন। যাঁহারা উৎকট অমিত্রচ্ছন্দ বাঙ্গালা ভাষার অনুপযোগী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা "মেঘনাদবধে" মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণবিকাশ দেখিয়া, লজ্জায় অধোমুখ হয়েন। "তিলোত্তমা" পাঠে তাঁহারা মুখ বিকৃত

করিলেও, "মেঘনাদবধ" পাঠে তাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হয়। তাঁহারা অমিত্র-চ্ছন্দের গৌরব বুঝিয়া, প্রীতিপুষ্পে প্রতিভাশালী মধুসূদনের অর্চ্চনা করিতে থাকেন। মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অমিত্রচ্ছন্দে কবিতা প্রণয়ন-সম্বন্ধে মধুসূদনের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। "তিলোত্তমাসম্ভব" তাঁহার উৎসাহে লিখিত এবং তাঁহার অর্থে মুদ্রিত হয়। তিনি "মেঘনাদবধে" মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া, অপরিসীম প্রীতি লাভ করেন। মধুসূদন এইরূপে বাঙ্গালা কাব্যে অচিন্ত্য-পূর্ব্ব বিষয়ের অবতারণা করিয়া, অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হয়েন। ভারতচন্দ্র কবিতাকে যে পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র যে পথের পথিক হইয়াছিলেন, মদনমোহন এবং রঙ্গলাল যে পথের গৌরব-বর্দ্ধনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, মধুসূদনের প্রতিভায়, সে পথ পরিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালা কবিতায় যে, এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা প্রথমে কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু মধুসূদনের ক্ষমতায় সহৃদয়গণ অসম্ভবকে সম্ভব বলিয়া মনে করেন। মধুসূদন অসাধ্য সাধন পূর্ব্বক ইঁহাদিগকে বিস্ময়ে যেরূপ স্তম্ভিত করেন, সেইরূপ কবিতারাজ্যেও চিরজয়ী এবং চিরগৌরবান্বিত, প্রতিভাশালী মহান্ পুরুষ বলিয়া সম্পূজিত হয়েন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের সংস্রবে উন্নতিপথে অগ্রসর হয়। কিরূপে বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ করিতে হয়; কিরূপে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে হয়; কিরূপে সমাজতত্ত্ব-ঘটিত বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়; রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় তাহার পথপ্রদর্শক। পাশ্চাত্য ভাষার অনুশীলন দ্বারা তিনি বোধ হয়, এই পথ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভায় বাঙ্গালা ভাষা অভিনব পথে পরিচালিত হয়। কৃষ্ণমোহন এবং রাজেন্দ্রলাল এই পথের প্রসারণে সবিশেষ যত্ন করেন। ইঁহাদের নানাবিষয়িণী অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালা ভাষা পাশ্চাত্য ভাষার সংস্রবে নানা বিষয়ে পুষ্টিলাভ করিতে

থাকে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির প্রতিভাবলে এ বিষয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়। রামমোহন যে বিষয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, অক্ষয়-কুমার সেই বিষয় সুসংস্কৃত এবং সমধিক উজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। বিভিন্ন সভ্য জনপদের ভাষা, ভিন্নদেশীয় উন্নতিশীল ভাষার সাহায্যে পরিপুষ্ট এবং শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা পাশ্চাত্য প্রণালীতে এবং পাশ্চাত্য ভাষার ভাবে সঞ্জীবিত হওয়াতেই উহার অভাবনীয় উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় বাঙ্গালা গদ্যে পাশ্চাত্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধুসূদনের প্রতিভায় বাঙ্গালা পদ্য অভিনব রীতিতে পরিচালিত হইয়া, গাম্ভীর্য্য ও ভাববৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছে। মধুসূদন দেখাইয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষা নবীন লতার ন্যায় কেবল কোমলভাবে আনত থাকে না। উহা দৃঢ়তায় ও স্থিতি-স্থাপকতায় অনেক কঠিন পদার্থকেও অতিক্রম করিয়া থাকে। যে কবিতা এক সময়ে কামিনীর কোমলকণ্ঠধ্বনির ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন নির্জীব ভাবের পরিচয় দিত, তাহা মধুসূদনের প্রতিভায় "মিত্রচ্ছন্দরূপ নিগড় ভগ্ন করিয়া" এবং গম্ভীর শব্দমালায় গ্রথিত হইয়া, গভীর ভাব প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবরাজ্যে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিদেশীয় সাহিত্যের উপকরণে স্বদেশীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-সাধন করিতে হইলে, স্বদেশীয় রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। মধুসূদনের এরূপ দৃষ্টি ছিল না। তিনি স্বয়ং যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, তাঁহার কাব্য সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচায়ক হইয়াছে। তিনি আত্মপ্রকৃতি ও আত্মরুচি অনুসারে কবিতাদেবীকে বিদেশীয় ভাবরত্নে সজ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ রত্ন জাতীয় প্রণালী অনুসারে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই। তাঁহার নাটক—তাঁহার কাব্য প্রভৃতিতে যে সকল বিদেশীয় উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদয়

জাতীয় ভাবের সহিত সম্মিলিত না হইয়া বিজাতীয় ভাবেরই স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিতেছে। তিনি স্বদেশীয় কাব্যকানন হইতে যে সকল ভাবকুসুম চয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয় জাতীয় প্রকৃতির অনুগত হওয়াতে, তদীয় কাব্যে জাতীয় ভাবের সমতা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু আত্মসংযমের অভাব-প্রযুক্ত মধুসূদন বিজাতীয় ভাবের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি পাশ্চাত্য ভাবে এরূপ বিমুগ্ধ ছিলেন যে, স্বদেশীয় ভাষা পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবে পরিপূর্ণ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হইতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবরাশি সর্ব্বাংশে তাঁহার নিকটে সমীচীন বোধ হইত। যে কোন প্রকারে হউক, ঐ সকল ভাব স্বদেশীয় সাহিত্যে সন্নিবেশিত হইলেই, তিনি সাহিত্যের চরমোৎকর্ষ হইল বলিয়া চরিতার্থ হইতেন। এই জন্যেই তাঁহার নিকটে রামায়ণ অপেক্ষা ইলিয়াদের অধিকতর সম্মান ছিল; এই জন্যেই তিনি স্বদেশীয় পুরাণ অপেক্ষা গ্রীক পুরাণের অধিকতর গৌরব করিতেন, এবং এই জন্যেই তিনি স্বদেশের উজ্জ্বল চরিত্রকে বিদেশের অপকৃষ্ট চরিত্রের ছায়াপাতে কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেন। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষগুণে, মাইকেল মধুসূদনও তেমনি দোষগুণে কবি। প্রত্যেক কবিরই দোষগুণ আছে, কিন্তু "দোষে গুণে কবি" এই প্রয়োগের অর্থ এই যে, যেমন তাঁহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব, বোধ হয়, মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালীর কবিতাতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে

হিন্দুপরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেই হিন্দুপরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পেণ্টুলন দেখা দেয়। আর্য্যকুলসূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া, রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও, তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। * মধুসূদন মেঘনাদবধে বাল্মীকির পদচিহ্নের অনুসরণ করিলেও, উহাতে এইরূপ বিজাতীয় ভাবের ছায়াপাত হইয়াছে। তিনি বিদেশীয় কাব্যের অনুকরণে বীরাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছেন ; কিন্তু চিরপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক কথার প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে এ কাব্যও বিজাতীয়ভাবে শূন্য হয় নাই। মধুসূদন যদি স্বকীয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রকৃতির সংযম করিয়া চলিতে শিখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তদীয় রচনায় বিজাতীয় ভাবের সংস্পর্শ ঘটিত না।

সমালোচক মহোদয়গণ মধুসূদনের রচনাগত অনেকগুলি দোষের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল দোষের মধ্যে বাক্যের জটিলতা, প্রাঞ্জলতার অভাব, উৎকট শব্দের সন্নিবেশ, অনুপযোগী উপমাসমূহের সমাবেশ, প্রথাবহির্ভূত ক্রিয়াপদের ব্যবহার প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভা এবং কল্পনার অপূর্ব্ব চাতুরী তাঁহার রচনার সমস্ত দোষের মধ্যেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। মধুসূদন স্বকীয় রচনার সকল স্থলে ভারতচন্দ্রের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ কোমল ও শ্রুতিমধুর শব্দের বিন্যাস করেন নাই। কিন্তু তিনি যে, শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাসে অসমর্থ ছিলেন, তদীয় ব্রজাঙ্গনা ও ও ক্ষুদ্র কবিতাবলী পাঠ করিলে তাহা প্রতীত হয় না। অমিত্রচ্ছন্দেও যে, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা তিনি

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা।

"বীরাঙ্গনায়" দেখাইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যে তিনি অপ্রসিদ্ধ ও উৎকট শব্দের সন্নিবেশের ইচ্ছা সংযত রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার ব্রজাঙ্গনায় ললিত পদাবলীর মাধুর্য্য আছে। রাধিকার পূর্ব্বরাগ, বিরহ প্রভৃতি সুকৌশলে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রজাঙ্গনাকার বৈষ্ণব কবিদিগের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মাধুর্য্যের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত মধুসূদনের মধুপ্রবাহের তুলনা হয় না।

মধুসূদন শব্দযোজনার চমৎকারিত্বে, যেমন ভারতচন্দ্রের নিম্ন স্থানে অবস্থিত, স্বভাববর্ণনে ও জাতীয় ভাবের রক্ষণে সেইরূপ মুকুন্দরামের নিম্নগণ্য। কিন্তু কল্পনার লীলায় এবং গভীর ভাবের বর্ণনায় তিনি বঙ্গের এই দুই জন শ্রেষ্ঠ কবিকে অতিক্রম করিয়াছেন। কবিপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মধুসূদনের মেঘনাদবধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থসমূহ সম্মিলিত করিয়া পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়,—যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়,—যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র হইতে হয়, এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি?

"* * * বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্ররচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য; কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?

কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গবেগ কই? বিদ্যুচ্ছটাকৃতি, বিশ্বোজ্জ্বল বর্ণনাচ্ছটা কোথায়? তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়;—বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতর্জ্জন নাই, —মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে, অথচ নয়ন-শ্রবণ-তৃপ্তিকর।" * সমালোচক মহোদয় এস্থলে কবিকঙ্কণ, মুকুন্দ-রামের কবিতার উল্লেখ করেন নাই! মধুসূদনের কাব্যে যে অপূর্ব্ব কল্পনাবিভ্রম আছে, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যে কাব্য স্বাভাবিক বর্ণনায় ও জাতীয়ভাবে উন্নত, কাব্যজগতে তাহাই শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়া থাকে। পুষ্পাভরণা বনলতা যেমন প্রকৃতিপ্রদত্ত সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী হয়, এই কবিতাও সেইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা হইয়া, পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। যত্নসাধ্য কৃত্রিম শোভা এই সৌন্দর্য্যের সমক্ষে পরাজয় স্বীকার করে। মুকুন্দরামের কবিতা অযত্নসম্ভূতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে গৌরবান্বিতা বনলতার সদৃশ। উহাতে কৃত্রিমতা নাই; বিলাসচাতুরী নাই; কঠোরতার সমাবেশ নাই; উহা অনায়াসলব্ধ সৌন্দর্য্যে আপনিই বিমুগ্ধ; অপরেও সেই সৌন্দর্য্যের সন্দর্শনে বিমুগ্ধ। মুকুন্দরাম এই গুণে বঙ্গীয় কবিকুলের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর মধুসূদন পাশ্চাত্য ভাবতরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখাইয়া যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার গুণে কবিসমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। ফলতঃ মধুসূদনের কবিতা কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন। অযত্নসম্ভূত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শিল্পকৌশলের সহিত সংযোজিত হইলে যেমন স্থলবিশেষে অধিকতর উজ্জ্বল এবং স্থলান্তরে অপরিস্ফুট ও অনুজ্জ্বল হয়, মধুসূদনের কবিতাও সেইরূপ কোথাও উজ্জ্বল এবং কোথাও বা অনুজ্জ্বল হইয়াছে। শিল্পী ধীরে ধীরে নানা দিক্ দেখিয়া, প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর

* শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মেঘনাদবধ-সমালোচনা।

আপনার শিল্পচাতুরীর পরিচয় দিয়া থাকে; প্রাকৃতিক বিষয়টি যে ভাবে রাখিলে ভাল হয়, ধীরতার অভাবে বা বিবেচনার ত্রুটিতে সকল সময়ে হয় ত তাহার হস্তে সেই ভাব রক্ষিত হয় না। কাব্যজগতে মধুসূদনও এক জন শিল্পীর তুল্য। তিনি স্বাভাবিক ভাবের উপর শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রণালীতে তিনি শিল্পকৌশল শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এইরূপ শিল্পকৌশলেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। যেখানে তিনি নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অধিকতর কৌশল প্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কবিতা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। তিনি প্রধানতঃ এই কারণেই কমনীয় প্রাকৃতিক ভাবের সংরক্ষণে বঙ্গের প্রাচীন কবিকুলের নিকটে পরাজিত হইয়াছেন।

সাহিত্যসংসারের অনেক প্রতিভাশালী লেখক পদ্যরচনায় যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, গদ্যরচনাতেও সেইরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। মিল্টন যেরূপ মহাকবি, সেইরূপ প্রধান গদ্যলেখক। তাঁহার পদ্যে যেরূপ ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্য আছে, তাঁহার গদ্যও সেইরূপ ওজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। আডিসন, গোল্ডস্মিথ্ প্রভৃতিও কবিত্বশক্তির ন্যায় গদ্যরচনায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনে এই দুই গুণের সমাবেশ হয় নাই। মধুসূদন হেক্টরবধ-নামক একখানি গদ্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গদ্য যেরূপ প্রাঞ্জলতাপরিশূন্য, সেইরূপ উৎকট, অপ্রসিদ্ধ ও অপ্রচলিত ক্রিয়ার সমাবেশে লালিত্যহীন। মধুসূদন প্রতিভাশালী কবি বলিয়াই পরিচিত। কবিতারাজ্যে তিনি অসামান্য প্রতিভা ও কল্পনাচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন। গদ্যে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সংসারে মধুসূদনের প্রীতিদায়ক, মধুসূদনের তৃপ্তিসাধক, মধুসূদনের শান্তিসম্পাদক, কিছুই ছিল না। মধুসূদন

সংসারমরুতে তৃষ্ণাকাতর, উদ্‌ভ্রান্ত পান্থস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার হতাশ হৃদয়ে যে নিদারুণ দুঃখানল প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় নাই। বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আসিলেও তিনি স্বদেশে আপনার অভাবমোচনে সমর্থ হয়েন নাই। চিত্তসংযমের অভাবে তিনি কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্ব্বত্রই ঘোরতর অশান্তি, তীব্রতর নৈরাশ্যের জ্বালায় নিরন্তর অস্থির ছিলেন। তাঁহার তাপদগ্ধ হৃদয়ে কখনও শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। তিনি কয়েকখানি অভিনব কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অশান্তিপ্রযুক্ত কোনও খানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের একমাত্র পুত্র হইয়াও, তিনি অর্থাভাবে কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন যেন অনন্ত কষ্টের অদ্বিতীয় প্রস্রবণস্বরূপ ছিল। তিনি বিদেশে থাকিয়া, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে যে মর্ম্মজ্বালা প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্বদেশ প্রত্যাবৃত্ত হইলেও, সে জ্বালার বিরাম হয় নাই। কপর্দ্দকশূন্য ভিক্ষার্থীও শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু মধুসূদনের অদৃষ্টে সংসারের সুখ বা শান্তি, কিছুই ঘটে নাই। বঙ্গের প্রতিভা-সম্পন্ন হতভাগ্য কবির অনন্তকষ্টময় জীবন এইরূপ অশান্তিতেই শেষ হয়। চিত্তসংযমের অভাবে, উদ্দাম ভোগলালসার প্রাদুর্ভাবে, নানা-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরও কিরূপ দুরবস্থা ঘটে, মধুসূদনের জীবন তাহা দেখাইয়া দিতেছে। মধুসূদন সত্ত্বগুণে আকৃষ্ট হইলে, সংসারে উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতেন না। সত্ত্বগুণের অভাবপ্রযুক্ত তিনি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক, স্বকীয় নামে শ্রীর পরিবর্ত্তে "মাইকেল" এই বিজাতীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া, বিজাতীয় ভাবের পরিচয় দেন; সত্ত্বগুণের অভাবে তিনি অপেয়-পান ও অখাদ্যভোজনে সন্তোষ প্রকাশ করেন; সত্ত্বগুণের অভাবেই তিনিই প্রিয়তম পরিজনের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপাতরম্য ভোগলালসায় আকৃষ্ট হইয়া, আপনিই আপনার দুঃসহ

কষ্টের কারণ হয়েন। তীব্র সুরা যেন তাঁহার জীবনসহচরী হইয়াছিল। তিনি উহার দর্শনে প্রীত হইতেন; উহার ঘ্রাণে উল্লাস প্রকাশ করিতেন; উহার স্বাদে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার এই তমোগুণময়ী প্রকৃতিই বোধ হয়, তাঁহাকে রাক্ষসকুলের সহিত প্রীতিসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন—"তাঁহার কাব্যসমূহ যেমন বাল্মীকি, হোমর, বার্জ্জিল, মিল্টন, কালিদাস, দান্তে, ট্যাসো, ভবভূতি প্রভৃতি নানা দেশের কবিগণের প্রদত্ত উপাদানে বিরচিত হইয়াছিল, তাঁহার নিজের প্রকৃতিও তেমনি বহু জনের প্রকৃতির সম্মিলনে সংগঠিত হইয়াছিল। পাণ্ডিত্যে এবং গাম্ভীর্য্যে তিনি মিল্টন; উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমপিপাসা এবং অসংযতেন্দ্রিয়তায় তিনি বায়রণ; ঔদার্য্য এবং মহাপ্রাণতায় তিনি বরন্স্; অমিতব্যয়িতা এবং পর দিনের চিন্তায় ঔদাসীন্য সম্বন্ধে তিনি গোল্ডস্মিথ্। * * * মধুসূদনের অবলম্বিত কোন চরিত্রে যদি তাঁহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার মেঘনাদবধের রাবণেই হইয়াছে। * * মেঘনাদবধের রাবণ মহামহিমান্বিত সম্রাট্, স্নেহবান্ পিতা, নিষ্ঠাবান্ ভক্ত এবং স্বদেশবৎসল বীর। কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী, সাগরপরিখাবেষ্টিতা লঙ্কা তাঁহার পুরী; বাসবাবজয়ী মেঘনাদ তাঁহার পুত্র; সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী প্রমীলা তাঁহার পুত্রবধূ। * * কিন্তু সকল থাকিয়াও রাবণ দরিদ্র হইতেও দরিদ্র, অনাথ হইতেও অনাথ। সৌভাগ্যগিরির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া, আর কাহারও বুদ্ধি তাঁহার ন্যায় অধঃপতিত হয় নাই। যে বিকসিত কুসুম তাঁহার হৃদয়-উদ্যান সুশোভিত করিত, যে উজ্জ্বল তারাবলী তাঁহার জীবনাকাশ জ্যোতির্ম্ময় করিত, বিধিবশে নয়, তাঁহার নিজ দোষে, সে কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত, এবং সে তারকামালা অস্তমিত হইয়াছিল। * * রাবণের এই শোচনীয় পরিণামের সঙ্গে পাঠক

মধুসূদনেরও পরিণাম চিন্তা করুন। সকল পাইয়াও মধুসূদনের ন্যায় হতভাগ্য কবি বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। সাংসারিক সুখসম্পদের জন্য, মনুষ্য বিধাতার নিকট যে সকল বস্তু কামনা করে, যাচ্ঞা ব্যতিরেকেই তিনি তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * তিনি ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র সন্তান; ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ে তিনি বারিষ্টার; পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষাসমূহে তিনি সুপণ্ডিত; দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সুহৃদ্, গুণপক্ষপাতী এবং প্রতিভার উৎসাহদাতা; সমকালবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে প্রতিভায় তিনি অগ্রগণ্য; তাঁহার স্বদেশীয় ভাষা এবং স্বদেশবাসিগণ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু হায়! এই উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের পর অতি ঘোর অন্ধকারময় রজনী মধুসূদনের জীবনাকাশ আবৃত করিয়াছিল। * * পৃথিবীর কীটপতঙ্গেরও মস্তক রাখিবার স্থান আছে; কিন্তু বঙ্গের নব্য কবিশিরোমণির তাহাও ছিল না। যে পরান্নভোজন এবং পরগৃহে অবস্থান আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ মৃত্যুতুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, মধুসূদনের ভাগ্যে তাহারও অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ ঘটিয়াছিল। আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে পরগৃহে বাস এবং পরদত্ত পিণ্ডে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল; তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকন্যাগণ কখনও উপবাসে, কখন পর্য্যুষিত অন্নে দিনপাত করিত; তিনি যাহাদিগকে প্রাণের অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন, তাহাদিগের মধ্যে একজন বিনা পথ্যে—বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিল; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, এ সমস্তই তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। আর সর্ব্বশেষে তিনি নিজে রাজপথের ভিক্ষুকের ন্যায় দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। যাঁহার রচনা পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহাকে আত্মীয়ের অপেক্ষাও আত্মীয় বলিয়া মনে করিতেন, মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন আর কেহ

যে তাঁহার মুখে জলগণ্ডূষ দিতে নিকটে ছিলেন না, ইহার অপেক্ষা অধিক শোচনীয় পরিণাম আর কি অধিক হইতে পারে।"

চিত্তসংযমের অভাবপ্রযুক্ত মধুসূদন যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তিনি স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খলভাবের জন্য সংসারের অতি কঠোর শাস্তিই ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে, তাঁহার প্রাণাধিক সন্তান বিনা চিকিৎসায় দেহ ত্যাগ করিয়াছে; তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনী তীব্র যাতনানলে দগ্ধীভূত হইয়া, এই রোগশোকতাপময় সংসারের নিকটে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; আর তিনি আজীবন নৈরাশ্যে কাতর, অভাবে অবসন্ন, দুঃসহ কষ্টে মর্ম্মাহত হইয়া, অযোগ্য স্থানে অপরিচিত দরিদ্র লোকের মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার কঠোর শাস্তি আর হইতে পারে না। কিন্তু, তিনি যে, মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণের নিকটে তিনি সমুচিত আদর প্রাপ্ত হয়েন নাই; তাঁহার স্বদেশ-বাসিগণ তদীয় অসামান্য প্রতিভার সমুচিত গৌরব রক্ষা করেন নাই। স্বদেশের সম্ভ্রান্ত ধনী অমিত্রচ্ছন্দাত্মক কাব্যপ্রণয়নে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; সম্ভ্রান্ত ধনীর অনুগ্রহে তিনি ভাগীরথী-তটশোভী, প্রশস্ত প্রাসাদে কিছু দিন বাস করিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার নাটকে সম্ভ্রান্ত ধনীর নাট্যশালা গৌরবান্বিত হইয়াছিল; তাঁহার কাব্যপাঠে তদীয় বন্ধুগণ অপরিসীম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার প্রতিভার সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয় নাই। বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে অনেকে স্বদেশীয় ধনীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছেন। স্বদেশীয় ধনীর সাহায্যে ও উৎসাহে অনেক কাব্য প্রণীত হইয়াছে। এইরূপ আশ্রয় না পাইলে বোধ হয়, দরিদ্র

* শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু-প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত।

কবিগণের দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না; অনবদ্য কাব্যকুসুম বোধ হয়, যথাসময়ে বিকসিত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্র আমোদিত করিত না। কবিদিগের এই আশ্রয়দাতারা যেরূপ কবিত্বের গুণগ্রাহী. সেইরূপ কবির প্রতিভার সম্মানরক্ষক ছিলেন। এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান সমভাবে এইরূপ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর অনুগ্রহে যেরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছে, মুসলমানের অনুগ্রহেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণীত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে দেশেরও অধঃপতন ঘটিয়াছে। যে জাতি পরের অনুগ্রহের জন্য লালায়িত, পরের সন্তোষসাধন জন্য যত্নশীল, পরকীয় সাহায্যে আত্মক্ষমতার বিস্তারে সর্ব্বদা উদ্যত হয়, তাহাদের মহত্ত্ব, তাহাদের স্বদেশানুরাগ আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সর্ব্বাংশে পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে তাহারা আপনাদের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে না। সুতরাং স্বদেশের প্রতি তাহাদের মমতা ও আস্থার হ্রাস হয়; স্বদেশীয়দিগের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, তাহাদের অমনোযোগ বা অনাদরের বিষয়মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। অধুনা আমাদের এইরূপ শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। বিদেশীয়দিগের আধিপত্যে আমাদের প্রকৃতি এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা স্বদেশের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছি না। আমরা কর্ণেল নীলকে পুরস্কৃত করিতে উদ্যত হই, কিন্তু সীতারামের নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করি। কাউপারের স্মৃতিচিহ্নস্থাপন জন্য চাঁদা দিতে আমাদের আগ্রহ হয়, কিন্তু হতভাগ্য স্বদেশীয় কবিগণের জন্য এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেও আমাদের প্রবৃত্তি হয় না! স্বদেশীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিতের দেহাত্যয় হইলে আমরা কোমলমতি বালক অথবা মুগ্ধস্বভাবা নারীর ন্যায় কাতরভাবে কেবল রোদন করিয়া থাকি। কিন্তু

তাঁহার জীবদ্দশায় তদীয় অসামান্য প্রতিভার সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হই না। আমাদের দৃঢ়তার এতই অবনতি ঘটিয়াছে যে, কেবল রোদন ভিন্ন আমাদের আর কোন উপায় নাই। আমরা রোদনের জন্য ভূমিষ্ঠ হই, চিরজীবন রোদন করিয়াই জন্মভূমির নিকটে চির-বিদায় গ্রহণ করি। দৃঢ়তার অবনতির সহিত আমাদের চরিত্রেরও এরূপ অবনতি হইয়াছে যে, আমরা আপনাদের জন্য যৎসামান্য যত্ন করিতেও উদ্যত হই না। ইংলণ্ড এখন আমাদের সকল বিষয়ের নিয়ন্তা হইয়াছে। আমরা সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দার শেষাংশে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের প্রতিভাশালী পণ্ডিতদিগকে নিরতিশয় দারিদ্র্যদুঃখের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত। এই সময়ে আমাদের দেশে প্রতিভার অনাদর ছিল না। সদাশয় ধনীর সাহায্যে বাগ্দেবীর উপাসকগণ পরমসুখে কাল যাপন করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের অসীম সৌভাগ্য; কিন্তু বর্ত্তমান কালেই আমাদের দেশের প্রতিভাসম্পন্ন সুলেখকদিগের একান্ত দুরবস্থা। ইংলণ্ডের লোকে উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে; আমরা অবনতিপথে অধঃপতিত হইয়াছি। লর্ড চেষ্টরফীল্ড এক সময়ে জন্সনের প্রতি যেরূপ দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের ধনিগণ স্বদেশীয় সাহিত্য-সেবকদিগের প্রতি সেইরূপ দাক্ষিণ্য দেখাইয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। জন্সন যেরূপ ঐ দাক্ষিণ্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন; আমাদের দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার নিদর্শন থাকিলে স্বদেশীয় সাহিত্যবীরদিগের তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তেজস্বী জন্সনের নিকটে লর্ড চেষ্টরফীল্ডের সমুচিত শিক্ষা হইয়াছিল; আমাদের দেশের কোন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের নিকটে অস্মদ্দেশীয় কোন ধনকুবেরের সেরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নাই। যাহা

হউক, মধুসূদন এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দেশে, এইরূপ সমবেদনাহীন লোকের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাহারা নিরন্তর পরানুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া, আপনাদের হীনতার পরিচয় দিতেছে, তাহাদের সমক্ষে মধুসূদন যে, অন্তিমকালে আশ্রয়বিহীন হইয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। স্বদেশীয়দিগের বেদনাবোধ থাকিলে, তিনি অন্তিম কালে অন্ততঃ স্ত্রীপুত্রদিগের কষ্ট দূর করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বদেশবাসী ধনী যদি তদীয় প্রতিভার গৌরব বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানগণ পর্য্যুষিত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিত না, এবং তিনিও নিরতিশয় শোচনীয়ভাবে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেহ ত্যাগ করিতেন না। মধুসূদন যদি কোনরূপে সম্মান লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশের দরিদ্রের নিকটেই তিনি তাহা পাইয়াছেন। ধনী যখন বিলাসতরঙ্গে দুলিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসী, দরিদ্র করুণাসাগর তদীয় দুঃসহ কষ্ট মোচনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মহৎ কার্য্য যখন ধনীর সমক্ষে অনাদর বা অমনোযোগের বিষয়মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার স্বদেশের এক জন দরিদ্র অধ্যাপকই তদীয় সমাধির উপর স্মৃতিচিহ্নস্থাপনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। মধুসূদনের রচিত মধুচক্র কখন মধুহীন হইবে না। গৌড়জন চিরকাল তাহা হইতে মধুপান করিবে। চিরকাল শত শত নরনারী তাঁহার কাব্য পাঠে আমোদিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অশ্রুপ্রবাহে প্লাবিত হইবে; কিন্তু মধুসূদনের স্বদেশের যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনী তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সম্মান-রক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কলঙ্ক কখনও অপসারিত হইবে না। মাতৃভাষার গৌরববৃদ্ধিকারীর প্রদীপ্ত প্রতিভার অনাদর মাতৃভাষার ইতিহাসে তাঁহাদের সুকীর্ত্তির পরিবর্ত্তে অপকীর্ত্তিরই ঘোষণা করিবে।

জন্ম।	মৃত্যু।
১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫।	২৫শে চৈত্র, ১৩০০।
২৪ পরগণার অধীন,	৯ এপ্রেল, ১৮৯৪।
কাঁটালপাড়া গ্রামে।	

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যাহারা দারিদ্রের কঠোর পীড়নে দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াও শাস্ত্রানুশীলনে যত্নশীল হয়েন, নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়াও স্বাবলম্বনে লোক-সমাজে প্রধান স্থান অধিকার করেন, উদরান্নের জন্য অপরের দ্বারে ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়াও শেষে আপনারাই প্রভূত সম্মানের সহিত সম্পত্তি লাভ করিয়া, অপরের আশ্রয়দাতা ও ভিক্ষাদাতা হইয়া উঠেন, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের বারংবার প্রশংসা করিতে হয়। এইরূপ দারিদ্র্যভাবের মধ্যে অনেক মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপ দরিদ্র্য দুঃখের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অবিচলিত থাকিয়া, অনেক মনস্বী পুরুষ আপনাদের অসামান্য প্রভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সমাজে আর এক শ্রেণীর কৃতী পুরুষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ইঁহাদের জন্ম হয় নাই; ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখে ইঁহাদের কোনরূপ দুর্দ্দশা ঘটে নাই; দারিদ্র্যসন্তাপে মর্ম্মাহত হইয়া, ইঁহারা সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় মলিনবেশে ও সজল-নয়নে অপরের দ্বারস্থ হয়েন নাই। সঙ্গতিপন্নের গৃহে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সঙ্গতিসহকৃত সুখশান্তির মধ্যে ইঁহারা প্রতিপালিত হইয়া-ছেন; সঙ্গতির সমবায়ে ইঁহারা বিনাকষ্টে বিনাবাধায় সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গতির মধ্যেও ইঁহাদের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটে নাই। ইঁহারা বিষয়ভোগের মধ্যেও সংযতভাবে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন

করিয়াছেন, এবং আপনাদের অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া, লোক-সমাজকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। পরমাত্মনিষ্ঠ সাধক যেমন নানা প্রলোভনে পরিবৃত হইয়াও, কোন দিকে দৃক্পাত না করিয়া, তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবতার ধ্যান করেন, ইঁহারাও সেইরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও, একাগ্রচিত্তে অমৃতময়ী বাগ্‌দেবীর উপাসনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে এইরূপ একটি প্রতিভাশালী, মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। একটি মনস্বী পুরুষ সংযতচিত্তে জ্ঞানানুশীলন পূর্ব্বক মাতৃভাষার পরিচর্য্যারূপ মহত্তর কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতৃভাষার সেবারূপ যে চিরপবিত্র ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল, সেই ব্রতের মহিমায় তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই কীর্ত্তি বিভিন্ন জনপদে প্রসারিত হইয়া, তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বিস্তার করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী লিখিয়াছেন। ঐ জীবনীতে তিনি আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের এই পরিচয় দিয়াছেন—"অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামে রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।"

প্রতিভাশালী পুরুষ, পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়প্রসঙ্গে আপনাকে ক্ষুদ্র লেখক বলিয়া বিনয়নম্রতার পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যাঁহার অমৃত-

ময়ী লেখনী হইতে 'রঘুবংশ' প্রভৃতি প্রসূত হইয়াছে, তিনিও সাধারণের সমক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধির অলোকসাধারণ কবিত্বশক্তিতে ও অসামান্য প্রতিভায় সমগ্র সহৃদয়সমাজ মোহিত রহিয়াছেন। আর যাঁহার রসময়ী লেখনীর গুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি ক্ষুদ্রলেখক বলিয়াই আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা কোন বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, এইরূপ সারল্যময় বিনয়ে তাঁহাদের মহত্ত্বের অধিকতর বিকাশ হয়; তাঁহারা লোকসমাজের অধিকতর বরণীয় হইয়া, সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকেন।

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র সুস্থ ও সবল ছিলেন না; রোগে তাহার দেহ নিরতিশয় নিস্তেজ ছিল। কিন্তু এই নিস্তেজ দেহই তেজস্বিনী প্রতিভার আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। বাল্যকালেই সেই প্রতিভার প্রভাব পরিস্ফুট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে সমগ্র বাঙ্গালা বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া গুরুমহাশয়ের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হয়েন। তাঁহার পিতা রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া, মেদিনীপুরে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তিনি তত্রত্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পাঠশালায় তাঁহার যেমন বুদ্ধি দেখা গিয়াছিল, পাঠানুরাগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রভাজাল ধীরে ধীরে বিকীর্ণ হইতেছিল, মেদিনীপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নসময়েও সেই সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সেই বলবতী বিদ্যানুশীলনপ্রবৃত্তি, সেই তেজস্বিনী প্রতিভার নিদর্শন লক্ষিত হয়। অষ্টমবর্ষীয় বঙ্কিমচন্দ্র যখন ইংরেজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেন, তখন শিক্ষকবর্গ বালকের বুদ্ধিচাতুর্য্যে ও শিক্ষানুরাগে বিস্মিত হইয়া-ছিলেন। বিদ্যালয়ে বালকের যে শক্তির বিকাশ হয়, তাহাতে শেষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার রত্নরাশিতে সমৃদ্ধ হইয়াছে সেই

রত্নরাশি চারিদিকে প্রভা বিস্তার করিয়া অপরাপর সভ্যসমাজের সমক্ষে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যখন জন্ম হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্র যখন মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তখন অশান্তির অভিঘাতে ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই অশান্তিতে নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়, সে সময়ে আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। আফগানেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া, স্বদেশের দুর্গম গিরিসঙ্কট নরশোণিতে রঞ্জিত করিয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড আক্‌লাণ্ড আত্মপক্ষের বহু সৈন্যনাশ ও বহু অর্থব্যয়ে দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হয়েন, সেই সময়ে সমগ্র পঞ্চনদ ভীষণ মহাযুদ্ধের বিকাশক্ষেত্র হইয়াছিল। পরাক্রান্ত শিখেরা কাহারও কথা না শুনিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। লর্ড হার্ডিঞ্জের ন্যায় রণপণ্ডিত গবর্ণর জেনারলও ইহাদের অসামান্য সাহস, পরাক্রম ও যুদ্ধকৌশলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। একটি মহাযুদ্ধে যেন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এইরূপ অশান্তির মধ্যেও প্রতিভাশালী বালকের পাঠের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে নাই। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক স্বদেশের অশান্তিসময়ে রীতিমত শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারেন নাই; এক এক সময়ে তাঁহার অধ্যয়নে অতিশয় বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া, নানা শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন, শেষে গরীয়সী জন্মভূমিতে যাইয়া, আপনার অভিজ্ঞতায় স্বদেশের সম্রাট্‌কেও চমৎকৃত করিয়া তুলেন। রাজ্যে অশান্তি ঘটিলেও অধ্যয়ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ অসুবিধা উপস্থিত হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে যে, উহার একাংশে আঘাত লাগিলেও অপরাংশ শৃঙ্খলাশূন্য হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ রাজ্যে আবির্ভূত হওয়াতেই তাঁহার বিদ্যানুশীলনের সহিত প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপর হুগলি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি এই কলেজে "সিনিয়ার স্কলার্সিপ্" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বি. এ, পরীক্ষার নিয়ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার একজন সমপাঠীর সহিত সর্ব্বপ্রথম এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বাঙ্গালার প্রথম লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব, তরুণবয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্রের গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে একটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; অতি তরুণ বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু শাস্ত্রানুশীলন বিসর্জ্জন দিলেন না। তিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন পুস্তকালয়ে বসিয়া বিবিধ পুস্তক পাঠ করিতেন; তিনি যখন সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখনও গ্রন্থ পাঠ করিয়া, নানা বিষয় শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ পাঠানুরাগ কখনও অন্তর্হিত হয় নাই। বাল্যাবধি ইংরেজী বিদ্যালয়ে, ইংরেজী প্রণালীতে, ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিয়াও, তিনি সংস্কৃতের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন কোন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের নিকটে সংস্কৃত শিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং মনোযোগের সহিত কয়েকখানি কাব্য ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। ইহার পর যখন রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত হয়েন এবং ঐ কর্ম্মসম্পাদনে গুরুতর পরিশ্রম করিতে থাকেন, তখন আইন পড়িয়া, বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।

জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি মাতৃভাষার পরিচর্য্যার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন; বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষার পরিচর্য্যা করিয়াই লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী ছিল। একাধারে তিনি কবি, উপন্যাসকার, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিৎ ও ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতায় বাঙ্গালা ভাষার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। স্বদেশীয় ভাষায় জ্ঞানবিস্তার না হইলে, কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না এবং কোন জাতি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় ভাষায় জ্ঞান বিস্তার করিয়া, স্বজাতিকে অভিজ্ঞ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বদেশের উপকারের জন্য বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানানুশীলনে স্বদেশের উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানে যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছে, বহুদর্শিতায় যেরূপ বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে, বিচারক্ষমতায় সেইরূপ বিবেকের পথে পরিচালিত হইতেছে। যিনি স্বদেশীয়দিগকে এইরূপে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া, পরস্পর সমবেদনাপর, পরস্পর একতাবদ্ধ, পরস্পর একাত্মভাবে অবস্থিত মহাজাতির মহিমান্বিত পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার স্বদেশভক্তি এবং স্বজাতিপ্রীতি অতুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতির পরিচয় দিয়া, অসামান্য কীর্ত্তির অধীকারী হইয়াছেন। এই জন্য তাঁহার এত গৌরব, এই জন্য তাঁহার এত সম্মান। তিনি অনেকবার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধলেখককে বলিয়াছিলেন যে, গ্রন্থ লেখা দেশের লোককে বুঝাইবার জন্য। যে লেখা দেশের লোকে বুঝিতে না পারে, এবং যে লেখায় দেশের লোকের উপকার না হয়, সে লেখায় কোন ফলোদয় হয় না। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ে এইরূপ লোকহিতৈষিতা

জাগরূক ছিল। তিনি দেশের লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রন্থ-প্রণয়ন করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন; ইংরেজী রচনায় যথোচিত ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন; ইংরেজী ভাষায় তাঁহার রচনা-কৌশল দর্শনে সুপণ্ডিত ইংরেজগণও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি জাতীয় ভাষার অনাদর করিয়া, কেবল ইংরেজী লেখাতেই ব্যাপৃত থাকেন নাই। তিনি একবার ইংরেজীতে একখানি উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে তাঁহার প্রীতিলাভ হয় নাই। কেবল Rajmohan's wife এর (রাজমোহনের স্ত্রীর) লেখক বোধ হয়, স্বদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতির লেখক সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি মাতৃভাষার সেবায় যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, মহাবিপ্লবেও তাহা বিনষ্ট হইবার নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তখন কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপ্রভাকরে কবিতা লিখিতেন; এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্র এবং দ্বারকানাথ অধিকারী সংবাদপ্রভাকরে আপনাদের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রভাকরসম্পাদক ইঁহাদের তিনজনের কবিতাই আদরসহকারে প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন। ইঁহাদের তিন জনের মধ্যে দ্বারকানাথ অধিকারীই সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার সুন্দর অনুকরণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইলেও, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার অনুকরণ করেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অতি সামান্য বিষয় সম্বন্ধে, উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতেন। তাঁহার রচনা যেরূপ সরল, সেইরূপ মধুর ছিল। স্বভাববর্ণনায় ও হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার শক্তি কোথাও

প্রতিহত হইত না। তিনি কাব্যজগতে কোনরূপ কল্পনাকৌশল গম্ভীর ভাব ও সৃষ্টিচাতুরী দেখাইতে সমর্থ না হইলেও সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনার গুণে বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সে সময়ে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহার রুচি নিরতিশয় বিকৃত হইত। তিনি এক সময়ে রচনামাধুরী প্রদর্শন করিতেন; অন্য সময়ে পঙ্কিলভাবে আপনার রচনা অপাঠ্য করিয়া তুলিতেন। এক সময়ে তাঁহার কবিতা হইতে অনাবিল রসধারা বহির্গত হইত; অন্য সময়ে তাঁহার কবিতা আবিলতায় এরূপ কলুষিত হইয়া উঠিত যে, সহৃদয়গণ উহা দেখিলে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিতেন। ফলতঃ ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার জন্য যখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিষময় শাণিতবাণ নিক্ষেপ করিতেন; তখন সেই বিষের তীব্র জ্বালায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী যেমন অস্থির হইতেন, অপরেও সেইরূপ অধৈর্য্য হইয়া উঠিত। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র ও গৌরীশঙ্করে যে কবিযুদ্ধ হইত, সে যুদ্ধের বর্ণনা ভদ্রসমাজে পাঠ করিতে পারা যাইত না। বঙ্কিমচন্দ্র এই কলঙ্ক হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপক্ষপাতী ছিলেন; এক সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছিলেন; গুরুর প্রতি সম্মান ও সমাদর প্রদর্শনে তিনি সর্ব্বদা উন্মত থাকিতেন; কিন্তু গুরুর দোষভাগের অনুকরণে তিনি কখনও যত্ন প্রকাশ করেন নাই। অনুকরণের হীনতায় অপর লেখকদিগের লেখনী যখন কলুষিত হইতেছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা স্নিগ্ধজ্যোতিঃ শশধরের ন্যায় নির্ম্মল প্রশান্ত ভাবের পরিচয় দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহ ও জীবনী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ জীবনীতে এইরূপে গুরুর রুচিবিকারের

উল্লেখ করিয়াছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র এবং তর্কবাগীশ রসরাজ অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। * * এই কবিতাযুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম; চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে, এত কদর্য্য হইতে পারে, তাহা অনেকে জানে না।" কদর্য্য ভাষার প্রতি তাঁহার এইরূপ ঘৃণা ছিল। কুরুচির আবির্ভাবে যে ভাষা কলুষিত হইয়াছে, কুনীতির প্রভাবে যে ভাষা কলুষিত হইয়াছে, কুশিক্ষার প্রাধান্যে যে ভাষা সমাজের বিশুদ্ধ ভাবকে পদদলিত করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই সে ভাষার প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, ভাষা জীবের মনোগত ভাব প্রকাশে অদ্বিতীয় উপায় স্বরূপ। মানব ঈশ্বরের সৃষ্টিগত চরমোৎকর্ষের অদ্বিতীয় নিদর্শন। সৃষ্টির এই চরমোৎকর্ষে সর্ব্বপ্রকার পবিত্র ভাবেরই চরমোৎকর্ষ সাধিত-হইয়াছে। সুতরাং মানবের ভাষা পবিত্রতায় সংযত, পবিত্রভাবে উন্নত এবং পবিত্রতার প্রশান্ত জ্যোতিতে চিরপ্রদীপ্ত হওয়া আবশ্যক। যিনি এই পবিত্র ভাষা পঙ্কিলভাবে অপবিত্র করেন, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তার সমক্ষে অপরাধী হয়েন এবং মানবের অযোগ্য কার্য্য করাতে নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার এই মহান্ ভাবের মহত্ত্ব হানি করেন নাই।

ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন কর্ত্তব্য ছিল, ভাষাকে সাধারণের বোধগম্য করাও তাঁহার সেইরূপ একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার এই গুরুতর কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকে নাই। তিনি অসামান্য প্রতিভাবলে আপনার এই সাধনায় সর্ব্বাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বপ্রবন্ধমালায় উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গালা গদ্য প্রথম অবস্থায় অস্পষ্ট ও অসংস্কৃত ছিল। মুদ্রিত গদ্য-

গ্রন্থের মধ্যে প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা এইরূপ ছিল—"ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশু রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক অনেক পশুগণ।" ইহার পর যে সকল গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত হইলেও তাদৃশ কোমল ও মধুর হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলিতে এবং রাজা রামমোহনের গ্রন্থসমূহে ভাষা অনেকাংশে সংশোধিত হয়। পাদরী কৃষ্ণমোহন এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলালও বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যখন বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি এবং অক্ষয়কুমারের সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, তখন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সহিত অসামান্য ওজস্বিতার সমাবেশ দেখিয়া, সহৃদয় বাঙ্গালী পাঠক আমোদিত ও আশ্বস্ত হয়েন। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, উভয়ের রচনাতে বহুলপরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজিত হইত। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ সমাসঘটিত শব্দমালারও সন্নিবেশ দেখা যাইত। শেষে বিদ্যাসাগরের রচনা সরল ও কোমল হইয়া আইসে। তাঁহার শকুন্তলা তদীয় সরল রচনার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু তাঁহার বেতালপঞ্চবিংশতিতে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিলেও, বিদ্যাসাগর ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করিয়া তুলেন নাই। তাঁহার রচনাগুণে বাঙ্গালা ভাষা শব্দসম্পত্তিতে যেরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ যথোচিত লালিত্য ও মাধুর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত শব্দাড়ম্বর দেখিয়া, কতিপয় কৃতী পুরুষ সাহিত্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হয়েন। সাধারণের সুবোধ্য ও নিত্যব্যবহার্য্য কথায় গ্রন্থাদি রচনা করাই ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইঁহাদের উদ্দেশ্য বিফল হয় নাই। ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে পথে পরিচালিত করেন, সে পথ পরিশেষে ভাষার সারল্য ও মাধুর্য্য-বৃদ্ধির পক্ষে বিস্তর সাহায্য করে।

রাধানাথ শিকদার এবং প্যারীচাঁদ মিত্র যখন বাঙ্গালারচনায় চিরপ্রচলিত কথার ব্যবহারে উদ্যত হয়েন, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে বেতালপঞ্চবিংশতি ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংস্কৃত শব্দময় রচনার প্রাধান্য ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন —"বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃতশব্দবহুল সাধুভাষা ব্যবহার করাতে, শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া, ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। উহার নাম 'মাসিক পত্রিকা'। ঐ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি লেখা থাকিত, 'এই পত্রিকা পণ্ডিত লোকদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়্‌তে চান পড়্‌বেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য এ পত্রিকা নহে।' ঐ পত্রিকায় টেকচাঁদ ঠাকুর-প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ কল্পিত টেকচাঁদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি দুই প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। নিত্যব্যবহার্য্য, প্রচলিত কথায় বাঙ্গালা রচনা স্থলবিশেষে কিরূপ মনোহারিণী হয়; সাধারণে উহার রসাস্বাদ করিয়া, কিরূপ পুলকিত হয়; ভাষা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না হইয়া, কিরূপ বিশালভাবে

পূর্ণ হইতে থাকে ; তাহা প্যারীচাঁদ মিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল', তাঁহার 'অভেদী', তাঁহার 'রামারঞ্জিকা', যে গ্রন্থ পাঠ করা যায়, সেই গ্রন্থে তাঁহার সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। সাহিত্য সাধারণের বোধগম্য হইলে, তদ্দারা দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র সাহিত্যকে সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন, এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা কেহ ভবিষ্যতে করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, সন্দেহ।

"আমি এমন বলিতেছি না যে, 'আলালের ঘরের দুলালের' ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না, সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে

সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালী সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।" *

বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদ ঠাকুরের রচনাপ্রণালীর যে ত্রুটি নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি স্বকীয় প্রতিভাবলে সেই ত্রুটির সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আপনার মনোগত ভাব পাঠকের চিত্তফলকে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া লেখকের রচনার একটি প্রধান গুণ। টেকচাঁদ ঠাকুর এই গুণের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনার ভাবগ্রহণে যেরূপ কোন কষ্ট হয় না, সেইরূপ সরলশব্দযোজনার গুণে উহা পাঠকেরও অপ্রীতিকর হইয়া উঠে না। বরং স্থলবিশেষে ঐ রচনা সংস্কৃতশব্দবহুল রচনা অপেক্ষা পাঠকবর্গের অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। কিন্তু টেকচাঁদের ভাষা গম্ভীর বিষয়ের অযোগ্য। যেখানে বর্ণনার বৈচিত্র্য ও ভাবের গাম্ভীর্য্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়, সেখানে টেকচাঁদের ভাষা লেখকের অভীষ্টসাধনে সমর্থ হয়

* প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত ভূমিকা।

না। এই ভাষা হাস্যরসমূলক বর্ণনার বিলক্ষণ উপযোগী, কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর ও অক্ষয়কুমার, রচনাগত গাম্ভীর্য্যরক্ষার জন্য সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর ভাষার এই স্তর হইতে অতি নিম্ন স্তরে গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্যের এই উভয় স্তরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ব্যোমযানবিহারী আকাশপথে উত্থিত হইলেও, বায়ুমণ্ডলের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। বায়ুপ্রবাহে যে স্তরে থাকিলে তাঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া অব্যাহত থাকে, জীবনী-শক্তির অপচয় না ঘটে, তিনি ততদূরে উঠিয়াই, আত্মক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নিম্ন স্তর অতিক্রম করিয়া, উচ্চ স্তরে উত্থিত হইলেও, জীবনীশক্তি বিসর্জ্জন দেয় নাই। এই ভাষা নিম্নভাগে থাকিয়া, যেরূপ রসমাধুরীর পরিচয় দেয়; ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াও, গাম্ভীর্য্যের সহিত সেইরূপ কমনীয় লাবণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে। উহা শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরসভাব প্রকাশ করে না এবং নিরতিশয় অপরিষ্কৃত ও অমার্জ্জিত গ্রাম্য ভাবেরও পরিচয় দেয় না। পুষ্পাভরণা লতা যেমন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের বিকাশ করে, অথবা শোভাকর শশধর যেমন স্নিগ্ধ করজালে চারি দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, উহাও সেইরূপ স্নিগ্ধভাবে পাঠকের হৃদয় প্রফুল্ল করিয়া থাকে। গাম্ভীর্য্যের সহিত কোমলতার, দুরূহ শব্দাবলীর সহিত সরল শব্দমালার, ওজস্বিতার সহিত প্রাঞ্জলতার সমতা রক্ষা করিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় ভাষাকে স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা গম্ভীর হইয়াও কোমল; সংস্কৃত শব্দাবলীতে গ্রথিত হইয়াও প্রাঞ্জল; নিত্যব্যবহার্য্য চিরপ্রচলিত কথার আশ্রয়স্থল হইয়াও গ্রাম্যতাহীন। রবরকে টানিলে ইচ্ছামত বাড়াইতে পারা যায়, ছাড়িয়া দিলেই উহা আবার পূর্ব্বাবস্থা

প্রাপ্ত হয়। রবরের স্থিতিস্থাপকতায় লোকের অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভাষাও স্থিতিস্থাপক হইলে, লেখকের বিভিন্নপ্রকার বর্ণনার পক্ষে অনুকূল হইয়া থাকে। লেখক যখন ইচ্ছা করেন, তখন ভাষাকে প্রসারিত করিয়া বর্ণনাবৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন এবং ইচ্ছামত ভাষাকে সঙ্কুচিত করিয়া, সামান্য সামান্য বিষয় বিবৃত করিতে পারেন। ভাষার এইরূপ স্থিতিস্থাপকতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবলে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে যেরূপ স্থল-বিশেষে প্রসারিত করিয়াছেন, স্থলান্তরে সেইরূপ সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছেন। নৈসর্গিক দৃশ্য প্রভৃতির বর্ণনায় তাঁহার ভাষা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, হাস্যরস প্রভৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে তাঁহার ভাষা সঙ্কুচিত হইয়া, সেই রসে মাধুর্য্যবৃদ্ধির সহায় হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ুরোপের জ্ঞানরাজ্যে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই সময়ে বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানঘটিত অনেক দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের আবিষ্কার করেন; ঐতিহাসিকগণ অভিনব উপাদানে ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন; কবি প্রতিভাগুণে কবিতাকে অভিনব পথে প্রবর্ত্তিত করেন; দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিৎ, উপন্যাসকার প্রভৃতিও নব উপকরণে নবীন ভাবে এবং নবীন প্রণালীর অনুমোদিত প্রাঞ্জল ও ওজস্বী ভাষায় আপনাদের ক্ষমতার পরিচয় দিতে থাকেন। চারি-দিকে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রসারিত হওয়াতে, পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনপদগুলি যেন এক কেন্দ্রে সন্নিবেশিত হয়। নানাস্থানে কলকারখানা হওয়াতে, শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। জনপদে জনপদে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, লোকের শিক্ষানুরাগ প্রবল হইয়া উঠে। প্রতি নগরে নানা বিদ্যার অনুশীলন হওয়াতে, বিবিধ সভায় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া, নানা বিষয়ে গবেষণার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েন। নগরসমূহের বাহ্য সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়। নগরবাসিগণ বিদ্যায় ও

সভ্যতায় লোকসমাজের বরণীয় হইতে থাকেন। নগরসমূহ যেমন শিল্প ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পূর্ব্বতন দুরবস্থা অতিক্রম করিয়া, সৌভাগ্য-সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, জানপদবর্গও সেইরূপ আপনাদের মধ্যে জ্ঞানালোকের প্রসারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ধনেরও বৃদ্ধি হয়। সাধারণের অবস্থা উন্নত হয়। নানা জনপদে পরিভ্রমণ ও জানপদবর্গের সহিত আলাপ করিয়া, লোকে বহুদর্শী হয়। ফরাসী, ইংরেজ, ইতালীয়, ও জর্ম্মান, পরস্পর মনোগত ভাবের আদান প্রদান করিতে থাকে। সেকেন্দর শাহের দিগ্বিজয়ে এবং রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রাধান্যে যেমন গ্রীস, সীরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ পরস্পরকে চিনিতে পারিয়াছিল, সেইরূপ ফরাসী, জর্ম্মান, ইংরেজ প্রভৃতিও বহুকাল বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া, ইয়ুরোপীয় সমরের সংঘাতে পরস্পরের আচার ব্যবহার ও মনোগত ভাব জানিতে পারে। এইরূপে এক জনপদের সভ্যতার সংস্রবে অন্য জনপদের সভ্যতা প্রসারিত হয়; এক জনপদের সাহিত্য ও বিজ্ঞান অন্য জন-পদের সাহিত্যবিজ্ঞান প্রভৃতির উপর প্রাধান্য স্থাপন করে; এক জনপদের রাজনীতির সংঘর্ষে অন্য জনপদের রাজনীতিও পরিবর্ত্তনোন্মুখ হইয়া উঠে। লোকে যেমন দার্শনিক তত্ত্বে অধিকতর অভিনিবিষ্ট হয়, সেইরূপ সমাজতত্ত্বে ও রাজনীতিতে সমদর্শী হইয়া উঠে। এক দিকে দার্শনিক ভাব, অপর দিকে সাম্যনীতিতে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হয়। তাহারা এত দিন সমাজের নিম্ন স্তরে অবস্থিতি করিতেছিল, দরিদ্রভাবে অবসন্ন হইতেছিল, অজ্ঞানান্ধকারে দিক্‌নির্ণয়ে অসমর্থ ছিল, এখন তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তাহারা সাম্য-নীতির প্রভাবে সমাজের নিম্ন স্তর হইতে উন্নত স্তরে উঠিতে আগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে দুইটি সভ্য জনপদ তাহাদের প্রধান পরিচালক হয়। জর্ম্মনির চিন্তাশীল লোকের হৃদয় হইতে যে ভাবপ্রবাহের উৎপত্তি

হয়, এবং ফ্রান্সের বিপ্লবপ্রয়াসী সমাজ হইতে যে রীতিনীতির আবির্ভাব হয়, তাহাতে প্রায় সমগ্র ইয়ুরোপ বিচলিত হইয়া উঠে। মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের এই দুই প্রবাহ দুই দেশ হইতে ইংলণ্ডে উপনীত হয়। ইহার অভিঘাতে ইংলণ্ডের সাহিত্য ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও নবীকৃত হইয়া উঠে। ইহাতে জনসন্ প্রভৃতির শব্দকাঠিন্য দূরীভূত হয়, ডিফো প্রভৃতির উপন্যাসরচনাপ্রণালী সংস্কৃত হয়, এবং ড্রাইডেন্ প্রভৃতির কবিতারচনারীতি ভিন্নদিকে প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে ইহা ইংলণ্ডের সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লব না ঘটাইয়া, সমগ্রবিষয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না করিয়া, ধীরে ধীরে ইংরেজী সাহিত্যে যে প্রশান্ত ভাব সঞ্চারিত করে, তাহা আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে।

ইংরেজী সাহিত্য যখন পরিবর্ত্তনপথে অগ্রসর হয়, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে একজন প্রতিভাশালী পুরুষ আবির্ভূত হয়েন। স্কটলণ্ডের এডিনবরা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিক্ষালাভ করিয়া বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। গ্রন্থরচনায় ইঁহার প্রতিপত্তি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইনি উকীল ও সেরিফ্ হইয়াও গ্রন্থপ্রণয়নে উদাসীন থাকেন নাই। ইঁহার প্রতিভা ইঁহাকে নানা বিষয়ের রচনায় প্রবর্ত্তিত করে। ইনি উপন্যাসকার ও সমালোচক বলিয়া যেরূপ প্রসিদ্ধ হয়েন, সেইরূপ কবি ও ঐতিহাসিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষতঃ ইঁহার উপন্যাস ইঁহাকে জগতের যাবতীয় সহৃদয়সমাজে অমর করিয়া তুলে।

অভিনব ভাবে পরিচালিত হইয়া, স্যার্ ওয়াল্টর্ স্কট্ স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনপূর্ব্বক সমগ্র সভ্য সমাজের বরণীয় হয়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডের সাহিত্যে যাহা ঘটিয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গসাহিত্যেও তাহাই ঘটে। বিজ্ঞানের প্রভাবে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে দূরতার হ্রাস হয়; ইংলণ্ডীয় সমাজের চিন্তাস্রোত প্রবলবেগে বঙ্গীয় সমাজে উপনীত হইতে থাকে। ইংরেজী ভাষার আলোচনা করিয়া, বাঙ্গালী অনেক অচিন্তনীয় বিষয়ের সহিত পরিচিত

হইয়া উঠে। এই সময়ে ইংলণ্ডের স্যার্ ওয়াল্টর্ স্কটের ন্যায় বঙ্গে একটি মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য অভিনব প্রণালীতে ও অভিনব ভাবে শ্রীসম্পন্ন করেন। জর্ম্মনি ও ফ্রান্সের ভাবপ্রবাহে ইংলণ্ডে সাহিত্য যেমন অভিনব পথে পরিচালিত হয়, ইংলণ্ডে নবীকৃত সাহিত্যের ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যও সেইরূপ পূর্ব্বতন পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্নপথগামী হইয়া উঠে। বঙ্কিম এই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বকীয় প্রতিভাগুণে বঙ্গীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, প্রতিভাশালী লেখকগণ ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হইতে মাইকেল মধুসূদন পর্য্যন্ত যে সকল কৃতী পুরুষ আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য তাঁহাদের সমক্ষে যে প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাঁহারা সেই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। বঙ্কিম এ বিষয়ে সবিশেষ কৌশলের পরিচয় দেন। তাঁহার প্রতিভায় বঙ্গীয় সাহিত্যে উপন্যাসরচনার প্রণালী সংস্কৃত হয়। তাঁহার পূর্ব্বে কয়েকখানি উপন্যাস প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎসমুদয়ে তাদৃশ প্রতিভাচাতুর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। যে উপন্যাসে কল্পনাচাতুরীর পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা পাঠ করিলে মানবের বিভিন্ন অবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র মানসপটে প্রতিফলিত হয়, যাহাতে চরিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হয়, মানব বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হইলে তাহার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সেই সেই অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মের সহিত কিরূপ সমতা রক্ষা করে, তদ্বিষয় যাহাতে স্পষ্টীকৃত হয়, বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যে সেইরূপ উপন্যাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজী উপন্যাস এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শস্থানীয় হইলেও, তিনি স্বকীয় উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কনে জাতীয় ভাবের রক্ষায় ঔদাস্য

প্রকাশ করেন নাই। ইংরেজী উপন্যাসের প্রণালী তাঁহার প্রতিভায় দেশকালপাত্রানুসারে সংস্কৃত হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের সহায় হইয়াছে। স্যার্ ওয়াল্টর্ স্কট্ ইংরেজী সাহিত্যে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যে বঙ্কিম সেইরূপ কৃতী পুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। উভয়ের প্রতিভাই উভয় দেশের সাহিত্যে নূতনত্বের সঞ্চার করিয়াছে। স্কটের ন্যায় বঙ্কিম বঙ্গীয় সাহিত্যে উপন্যাসরচনার অভিনব রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মতত্বের বিচারে, লোকরহস্যের উদ্ভেদে, চরিত্র সঙ্কলনে, ইতিহাসের জটিল বিষয়ের মীমাংসায় তিনি যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। স্কট্ রাজকীয় কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তদীয় সমস্ত অভাব মোচিত হইত না। তাঁহার আবাসবাটী ইত্যাদি তদীয় গ্রন্থ বিক্রয়ের অর্থ দ্বারা প্রশস্ত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বেতন সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। তিনি তাঁহার কলিকাতাস্থ আবাসবাটী পুস্তকবিক্রয়ের অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন। স্যার্ ওয়াল্টর্ স্কট্ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। শেষে ব্যবসায়ে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত হয়েন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত বা তৎপ্রযুক্ত কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসলেখক মিল্টন ও স্কটের প্রসঙ্গে নির্দ্দেশ করেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে এমন দুইটি চিরস্মরণীয় ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মিল্টন দারিদ্র্যে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, বার্দ্ধক্যে যৌবনোচিত উৎসাহ ও শ্রমশীলতা হারাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি

জগতের সমক্ষে আপনার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে কাতর হয়েন নাই। ছয় বৎসর কাল ধীরতা ও সহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রম করিয়া, তিনি যে মহাকাব্যের সৃষ্টি করেন, তাহা তদীয় মহীয়সী কীর্ত্তির অদ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ হয়। ব্যবসায়ে স্যার্ ওয়াল্টর স্কটের প্রায় ১২ বার লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। কিন্তু ইহাতেও তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। উত্তমর্ণদিগকে প্রবঞ্চিত করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তিনি ঋণদায়ে বিব্রত হইলেও দুশ্চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়েন নাই। তিনি ঋণ পরিশোধর জন্য লেখনীর সাহায্য গ্রহণ করেন। ছয় বৎসর কাল, ধীরভাবে পরিশ্রম করিয়া, তিনি যে সকল উপন্যাস প্রকাশ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার ঋণশোধের অনেক সুবিধা হয়। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসলেখক এই দুইটি ঘটনাকে অদ্বিতীয় বলিয়া, আপনাদের সাহিত্যের গৌরববিস্তারে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বোধ হয়, ইহা অপেক্ষাও বিচিত্র ঘটনার নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অক্ষয়কুমারের সহিষ্ণুতা মিল্টনের সহিষ্ণুতাকেও অতিক্রম করিয়াছে। স্যার্ ওয়াল্টর্ স্কট্ গুরুতর দায় হইতে মুক্তি পাইবার জন্য গ্রন্থ-প্রণয়নে অধ্যবসায় দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কোনরূপ দায়গ্রস্ত হয়েন নাই, উত্তমর্ণের তাড়নার আশঙ্কাতেও বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। তিনি রাজকীয় কর্ম্মে গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শেষে বার্দ্ধক্যে বিশ্রামলাভের আশায় অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে অবস্থায় মানুষ পরিশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া, বিশ্রামসুখ উপভোগের জন্য ব্যগ্র হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই অবস্থায় যে মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য গৌরবান্বিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে, সমুদয় পাঠকবর্গের সমক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হয়েন, তখন ইংরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার হয়।

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, নগরে নগরে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। অর্থোপার্জ্জন, রাজদ্বারে সম্মানলাভ, সমাজে প্রতিপত্তিসঞ্চয় প্রভৃতি যে সকল বিষয় লোকে আকাঙ্ক্ষা করে, তৎসমুদয় রাজভাষার সাহায্যে লাভ হয় বলিয়া, অনেকেই উহার অনুশীলনে অভিনিবিষ্ট হয়েন। সঙ্গতিপন্ন ও সহায়সম্পন্ন লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এইরূপে বঙ্গীয় সমাজে ইংরেজী শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ না হইলে কেহই সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, এই অপসিদ্ধান্তও ক্রমে বাঙ্গালীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে থাকে। রাজপুরুষগণ সময়ে সময়ে বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিতেন। বাঙ্গালী যদি স্বদেশীয় ভাষায় উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিত, তাহা হইলে তাঁহারা নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। বাঙ্গালী ইংরেজীতে পুস্তক লিখিলে তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হইত। মহামতি বীটন্ সাহেব মধুসূদনের "ক্যাপ্টিব্ লেডি" পড়িয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের যত্নাতিশয়েও সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে বাঙ্গালীদিগের তাদৃশ অনুরাগ দেখা যায় নাই। ইংরেজী শিক্ষার প্রাবল্যে স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনের পথ যেন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে বঙ্গসমাজের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ সঙ্কীর্ণতার একটি কারণের উপলব্ধি হয়। যাঁহারা ইংরেজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমক্ষে ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতির বিশাল ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহারা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যে বিষয়ে কৌতূহলতৃপ্তি করিতে উদ্যত হইতেন, ইংরেজী ভাষা তাঁহাদের সমক্ষে সেই বিষয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ উপস্থিত করিত। কিন্তু দরিদ্র বঙ্গভাষা সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে আমোদিত করিতে

সমর্থ ছিল না। তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষাভিমানে অধীর হইয়াছিলেন। এই অধৈর্য্যপ্রসক্ত মাতৃভাষার দারিদ্র্য তাঁহাদের দুঃখের বিষয়মধ্যে পরিগণিত না হইয়া, উপহাসের বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাঁহারা যদি যথার্থ অভিমানে পরিচালিত হইতেন; অহঙ্কারে উন্মত্ত না হইয়া যদি তাঁহারা আত্মপ্রকৃতি সংযতভাবে রাখিতে চেষ্টা করিতেন; তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষিতার উন্মেষ হইত। তাঁহারা মাতৃভাষার অনুশীলন এবং উহার অভাবমোচনের নিমিত্ত পরিশ্রম, যত্ন ও একাগ্রতার পরিচয় দিতেন; কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা তাঁহাদিগকে বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞ করিলেও তাঁহারা স্বদেশের ভাষাসম্বন্ধে দূরদর্শী বা উন্নতহৃদয় হয়েন নাই। স্বদেশীয় ভাষায় কিছুই নাই, সুতরাং স্বদেশীয় ভাষা অনুশীলনের অযোগ্য, এইরূপ ধারণা তাঁহাদিগকে অপথে পরিচালিত করিয়াছিল। তাঁহারা মাতৃভাষার আলোচনা বিসর্জ্জন দিয়া, পরকীয় ভাষার অনুশীলনে তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তাঁহারা অপরের প্রাসাদ দেখিয়া পুলকিত হইতেন, কিন্তু যে পর্ণকুটীর তাঁহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতেছে, তাহার সংস্কারে তাঁহাদের অভিরুচি হইত না। যিনি এইরূপ উদাসীনদিগকে স্বদেশীয় ভাষার উজ্জ্বলভাব দেখাইয়া, উহার অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন, তিনি নিঃসন্দেহ অসীমপ্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্র এই মহৎ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। নর্ম্মানেরা ইংলণ্ডে অধিকার স্থাপন করিলে, ইংরেজগণ নর্ম্মানদিগের ভাষা, নর্ম্মানদিগের বেশভূষা, নর্ম্মানদিগের আচারব্যবহার অবলম্বন করে। বালকবালিকারা বিদ্যালয়ে নর্ম্মানদিগের ভাষা শিখিতে প্রবৃত্ত হয়। বিধিব্যবস্থা নর্ম্মানদিগের ভাষায় লিখিত হয়। ধর্ম্মাধিকরণে নর্ম্মানদিগের ভাষায় বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তিন শত বৎসর কাল এইরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে

ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ফরাসী ভাষার প্রাধান্য থাকে। শেষে ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের আদেশে ইংলণ্ডে ইংরেজী ভাষা প্রচলিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরে, ধর্ম্মযাজক উইক্লিফ্ ইংরেজীতে আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে ইংলণ্ডের লোক আপনাদের ভাষার গৌরব বুঝিতে পারিয়া, উহার আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হয়। একজন ধর্ম্মযাজকের ধর্ম্মগ্রন্থানুবাদে ইংলণ্ডের এইরূপ মহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়াছিল। নর্ম্মানেরা ইংরেজদিগকে ভাষাসম্বন্ধে যেরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইংরেজ বাঙ্গালীদিগকে সেরূপ আবদ্ধ করেন নাই। বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মাধিকরণে, বিধিব্যবস্থায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য থাকিলেও, বাঙ্গালীর সমক্ষে স্বদেশীয় ভাষার দ্বার অবরুদ্ধ বা স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য দেখিয়া, আপনিই আত্মহারা হইয়াছিল, এবং আত্মহারা হইয়া, ইহারা মাতৃভাষার পরিচর্য্যায় উদাসীন রহিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে উদ্যত হয়েন। তাঁহার উদ্যম, তদীয় বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শনে' পরিস্ফুট হয়। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রচারে ইংরেজীপ্রিয় বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতে থাকে। যাঁহারা এতদিন বাঙ্গালা ভাষাকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছিলেন; বাঙ্গালা ভাষা এতদিন যাঁহাদিগকে আমোদিত করিতে অসমর্থ ছিল; তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত হয়েন, এবং আপনাদের অযথা অভিমানে আপনারাই লজ্জিত হইয়া, উহার অনুশীলনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতিতে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ও নূতনত্ব আছে, তৎসমুদয়ই 'বঙ্গদর্শনে' সমাবেশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' এইরূপে নানা বিষয়ে গুণগরিমার পরিচয় দিয়া, ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালীদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করে। যাঁহারা কেবল ইংরেজী পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন,

ইংরেজীতে রচনাশক্তির পরিচয় দিতে উদ্যত হইতেন, ইংরেজী ভাষার জয় ঘোষণায় যত্ন প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা 'বঙ্গদর্শন' পাঠে মনোযোগী হয়েন, এবং উহার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদের অনেকে মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। ইঁহাদের মহীয়সী পরিচর্য্যার ফল এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয় হইয়াছে। ইঁহাদের পাণ্ডিত্য, ইঁহাদের গবেষণা, ইঁহাদের রচনাচাতুরী, বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি করিয়াছে, সেইরূপ উহার সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ধর্ম্মযাজক উইক্লিফ্ একটি স্বাধীন জাতিকে আপনাদের ভাষার দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; বঙ্কিমচন্দ্র রাজকীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও, স্বকীয় ভাষার সৌন্দর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পরাধীন জাতির পরাধীনতাজনিত মোহ ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডে উইক্লিফ্ যাহা করিয়াছেন, বঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকর্তৃক তদপেক্ষা মহত্তর কার্য্য সাধিত হইয়াছে। উইক্লিফের অনুবাদ অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভাবনা সাহিত্যের ইতিহাসে অধিকতর সম্মান ও শ্রদ্ধালাভের যোগ্য।

'বঙ্গদর্শন' এক দিকে যেমন ইংরেজীপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গের সাধারণ পাঠকবর্গকেও রচনাশিক্ষার সহিত নানাবিষয়ে উপদেশ দিয়াছে। যে স্রোত পূর্ব্বে অতি সঙ্কীর্ণ ও অবরুদ্ধপ্রায় ছিল, তাহা বঙ্কিমের প্রতিভাগুণে সঙ্কীর্ণভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক খরতর বেগে প্রবাহিত হইয়া, সাহিত্য-ক্ষেত্রের সমস্ত আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়াছে, এবং আপনার অসামান্য স্নিগ্ধভাবে বঙ্গীয় ভাষায় এরূপ জীবনীশক্তি সমর্পণ করিয়াছে যে, সেই শক্তিতে ভাষা সজীব ও সতেজ থাকিয়া, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জনপদের উন্নতিশীল ভাষার সমকক্ষতালাভে অগ্রসর হইতেছে। যিনি সাহিত্যরাজ্যে এইরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা

সেরূপ অসামান্য, তাঁহার প্রতিভাও সেইরূপ অতুল্য। সাহিত্যরাজ্যে তিনি সাহিত্যসেবকদিগের চিরশ্রদ্ধাস্পদ ও চিরবরণীয় হইয়া থাকিবেন।

ঐতিহাসিককে নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীর অধীন হইয়া চলিতে হয়। যে ঘটনার যে ফল হইয়াছে, ঐতিহাসিক সেই ঘটনার বা সেই ফলের কোনরূপ বিপর্য্যয় করিতে পারেন না। বিশ্বশত্রু পাষণ্ডও যদি চিরজীবনে আত্মদুষ্কৃতির ফলভোগ না করে, মানুষ সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলিয়া মনে করে, তাহার অদৃষ্টে যদি চিরজীবন সেইরূপ সুখভোগ ঘটে; তাহা হইলেও ঐতিহাসিক তাহার দুষ্কৃতির পরিবর্ত্তে সুকৃতি এবং তাহার সুখভোগের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগের উল্লেখ করিতে পারেন না। নির্দ্দিষ্ট ঘটনাবলীর যথাযথ বর্ণনা করা ঐতিহাসিকের কার্য্য। এই জন্য ঐতিহাসিকের প্রদর্শিত চিত্র কল্পনাচাতুরীর পরিচয় না দিয়া, প্রকৃত ঘটনা প্রদর্শন করে। কবি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অধীনতা স্বীকার করেন না। কল্পনাবলে তিনি নানা বিষয় রচনা করিতে পারেন, কল্পনাবলে তিনি পাপীকে অপদস্থ এবং ধার্ম্মিককে পুরস্কৃত করিতে সমর্থ হয়েন; কল্পনাবলে তিনি পাপের জন্য কঠোর শাস্তি এবং ধর্ম্মের জন্য দেববাঞ্ছনীয় পুরস্কারেরও বিধান করিতে পারেন। প্রতিভা সহায় হইলে, তাঁহার কল্পনা এমন সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে যে, লোকে তাহা দেখিলে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমোদ লাভ করিয়া থাকে। উপন্যাসকারগণ কবির ন্যায় কল্পনার সহায়তা লাভ করেন। কল্পনাবলে এবং প্রতিভাগুণে তাঁহাদের প্রদর্শিত চিত্রও চিত্তবিমোহন হয়। লোকসমাজের প্রথমাবস্থায় কল্পনার আধিপত্য থাকে। কল্পনা যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া রাখে, উত্তরকালে সমাজের উন্নত অবস্থায় তৎসমুদয়ের মধ্য হইতে ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হয়। রামায়ণ বা মহাভারতে বাল্মীকি বা ব্যাসের কল্পনাচাতুরী প্রদর্শিত হইলেও, উত্তরকালে ঐ বিষয় হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের ইতিহাস জানা গিয়াছে।

হোমরের মহাকাব্য হইতে গ্রীসের পূর্ব্বতন আচার-ব্যবহারের বিশদ চিত্র আবির্ভূত হইয়াছে। কবিকল্পনা বিষয়-বিশেষে ইতিহাসের সহায় হইলেও, উহা ইতিহাসের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারে না। ইতিহাসও, কোন বিষয়ে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে না। স্যার্ ওয়াল্টর্ স্কট্ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিলেও, কল্পনার অপ্রতিহত গতির নিরোধ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উপন্যাসে ইতিহাসের চিরন্তন রীতি রক্ষা করেন নাই। কল্পনাবলে তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। কবি ও উপন্যাসকার এইরূপে কল্পনারাজ্যে বিচরণপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে সর্ব্ববিষয়ক সৌন্দর্য্যের সহিত চিরপরিচিত করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিভাগুণে নিসর্গসৌন্দর্য্য যেমন পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত হয়; মানবহৃদয়ের সৌন্দর্য্যও সেইরূপ পাঠকের অনুভূত হইয়া থাকে। পাঠক এক সময়ে দুরাচারের হৃদয়ের কঠোরভাব দেখিয়া, যখন উহার অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করেন, তখন সেই শোচনীয় পরিণামই তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ্যের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া থাকে। অপর সময়ে তিনি সাধুবৃত্তির মঙ্গলকর কার্য্যপরম্পরা দেখিয়া, সাধুভাবের সৌন্দর্য্যে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয় উপন্যাসে সৌন্দর্য্যরাজ্যের গৌরব দেখাইয়া, সহৃদয়দিগের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছেন। মানবহৃদয়ের বিভিন্ন বৃত্তি বিভিন্ন অবস্থায় কিরূপ কার্য্য করে; মানব ঘটনাচক্রে পতিত হইলেও তাহার ঐ সকল বৃত্তি কিরূপে স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করে; ঘটনাবিশেষে বৃত্তিবিশেষের সৌন্দর্য্য কিরূপে পরিস্ফুট হয়; বঙ্কিমের উপন্যাস তাহার প্রধান পরিচয়-স্থল। কল্পনার আবেগে বঙ্কিম কোন কোন স্থলে আনুষঙ্গিক ঘটনায় অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা অস্বাভাবিক হইলেও, তাঁহার উপন্যাসবর্ণিত লোকের হৃদয়গত বৃত্তি স্বাভাবিকভাব

বিসর্জ্জন দেয় নাই। তরঙ্গময়ী ভাগীরথীর খরতর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রণয়সম্ভাষণ অস্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনীর হৃদয়ের বৃত্তি যে যে অবস্থায় যে যে কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে অস্বাভাবিক ভাবের ছায়াপাত হয় নাই। এই সকল বিষয়ে বঙ্কিমের উপন্যাসে তাদৃশ অস্বাভাবিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কল্পনার সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মভাবের সংযোগ থাকা আবশ্যক। ধর্ম্ম-রাজ্যের চিরন্তন প্রকৃতি অব্যাহত রাখিয়া, যিনি কল্পনা-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহার প্রতিভাই লোকসমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। কাব্যে ও উপন্যাসে কল্পনার প্রভাবের মধ্যে ধর্ম্মভাব অব্যাহত রাখাই প্রতিভার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিভাশালী চরিত্রের পবিত্রতা, সত্যের সম্মান, জীবনের সাধু উদ্দেশ্য, ধর্ম্মের মহীয়সী শক্তি, লোকের মানসপটে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়া দিবেন। তিনি নরহত্যাকারী বা সর্ব্বস্ব-বিলুণ্ঠনকারী পাষণ্ডের চরিত্রেও এরূপ মহান্ উপদেশ নিবদ্ধ রাখিবেন যে, সেই উপদেশের সহিত এক জন বিশ্বহিতৈষী তপস্বীর অকলঙ্ক চরিত্রের উপদেশও অতুলনীয় হইতে পারে। অভাবনীয় বিষয়ের সৃষ্টিকারিণী শক্তি যখন পবিত্র ভাবের সহিত সংযোজিত হয়, তখন উহা প্রতিভার সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেবল সদুপদেশমূলক বক্তৃতা দ্বারা এই শক্তি প্রকাশিত হয় না। উপন্যাসপাঠকালে সাধারণে এইরূপ বক্তৃতায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। উপন্যাসকারকে স্বকীয় কল্পনারাজ্যে পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দেখাইতে হয়। শিল্পী যেমন চিত্রের যথাস্থানে যথাযথ রঙ্ দিয়া লোকের সমক্ষে উহাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলেন, উপন্যাসকার সেইরূপ স্বকীয় চরিত্র অঙ্কনে শিল্পকৌশলের পরিচয় দিবেন। তাঁহার প্রত্যেক চিত্র উদার ও মহান্ ভাবের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিবে। পাপের মধ্যে পুণ্যের স্নিগ্ধজ্যোতির বিকাশ করাও তাঁহার রচনার একটি প্রধান

উদ্দেশ্য। যিনি এই উদ্দেশ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, তিনি সমাজের শিক্ষাদাতা হইতে পারেন না। জনসাধারণকে উচ্চ শ্রেণীর দর্শন, বিজ্ঞান বা ইতিহাস প্রভৃতির অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত করা সহজ নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে সুখপাঠ্য উপন্যাসে একান্ত আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উপন্যাসকারকে সাধারণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষসাধনরূপ মহৎ কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এই মহৎ কর্ত্তব্য যথানিয়মে সম্পন্ন হইলেই উপন্যাস রচনা সার্থক হইয়া থাকে। বঙ্কিমের উপন্যাসরচনা এইরূপে সার্থক হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে মহান্ ভাবের বিপর্য্যায় ঘটে নাই; তাঁহার প্রতিভারাজ্যে পাপের জয়ঘোষণা হয় নাই; এবং তাঁহার সৃষ্টিতেও ধর্ম্মভাবের অবনতি দেখা যায় নাই। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন যে, 'বিষবৃক্ষে' তিনি কিয়দংশে স্খলিতপদ হইয়াছেন; কিন্তু অন্যান্য উপন্যাসে এবিষয়ে তাঁহার প্রতিভার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয়স্থল।

উপন্যাসকার প্রতিভাসম্পন্ন হইলে সমাজের সকল শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিতে পারেন। উচ্চ শ্রেণীর চিত্র যেমন তাঁহার কৌশলময়ী তূলিকায় অঙ্কিত হয়, নিম্নশ্রেণীর চিত্রও সেইরূপ তাঁহার কৌশলে পাঠকের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের লেখকগণ সর্ব্বপ্রথম সমাজের উচ্চ শ্রেণীর বিষয় লইয়া কবিতা ও উপন্যাস রচনা করিতেন। পরে নিম্নশ্রেণীর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। রাজনীতির পরিবর্ত্তনে সমাজের নিম্নশ্রেণীর অবস্থা যখন পরিবর্ত্তিত হয়, নিম্নশ্রেণীর লোকে যখন মানসিক শক্তিতে উচ্চ শ্রেণীর প্রতিযোগী হইতে থাকে, তখন কল্পনাপ্রিয় লেখকগণ তাহাদের চরিত্র-সৃষ্টিতে কৌশলের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েন। নিম্নশ্রেণীর লোকে আপনাদের চরিত্রে এরূপ সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে যে, উহার সমক্ষে

উচ্চশ্রেণীর চরিত্রবান্ লোকেও অবনতমস্তক হইতে পারেন। ইংলণ্ডের উপন্যাসকারগণ সময়ের পরিবর্ত্তনে শেষে নিম্ন শ্রেণী হইতেই আপনাদের বিষয় নির্ব্বাচন করেন। ভিক্তোর হুগো ও রুশো এই শ্রেণীর উপন্যাস। ক্রমে এইরূপ উপন্যাসের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। পরবর্ত্তী উপন্যাসকারগণ ঐ প্রসারিত ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্যসম্পাদনে ব্যাপৃত হয়েন। বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উচ্চ শ্রেণীর বিষয় লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ক্রমে নিম্নশ্রেণীর বিষয়ও তাঁহার বর্ণনীয় হয়। তিনি এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যপ্রদানেও আপনার প্রতিভার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। সুশিক্ষা, সৎসংসর্গ, উদার জাতীয় ভাব, বংশপরম্পরায় যাঁহাদিগকে হৃদয়ের মহত্ত্বপ্রদর্শনে প্রবর্ত্তিত করে, তাঁহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য্য সহজেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর যে সকল লোকের এইরূপ মহৎ অবলম্বন নাই, তাহাদের চরিত্রসৃষ্টিতে নিরতিশয় কৌশলের প্রয়োজন হয়। প্রতিভা সহায় না হইলে, এ বিষয়ে কৌশল দেখাইতে পারা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র স্বকায় প্রতিভার সাহায্যে এইরূপ চরিত্রসৃষ্টিতে যথোচিত কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার কোন কোন উপন্যাস ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিষয় লইয়া লিখিত হইলেও, তৎসমুদয় ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত হয় নাই। তিনি একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "রাজসিংহ" ইতিহাসের নিগূঢ়তত্ত্বে এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের সৌন্দর্য্যে বঙ্গীয় সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

মধুসূদনের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যক্ষেত্রে বীরোচিত প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের দুশ্ছেদ্য আবরণ হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে বিমুক্ত করেন, তখন অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়াছিলেন, অনেকে তাঁহার রচনার নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, অনেকে তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন,

কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হয়েন নাই। তরুণবয়সেই তাঁহার এইরূপ দৃঢ়তার বিকাশ হইয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তিনি পঠদ্দশায় "সংবাদ প্রভাকরে" মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিতা পারিতোষিকের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব্বে তিনি আবার পুরস্কার লাভের জন্য একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে এই পুরস্কার লাভও ঘটে নাই। ইহাতেও তিনি নিরুদ্যম হয়েন নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার সময়ে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে তাদৃশ উৎসাহ দেন নাই; মুদ্রিত করিবার সময়েও উহা যথারীতি সংশোধিত হয় নাই। এইরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁহার প্রথম প্রধান গ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য কীর্ত্তির সূত্রপাত ঘটে। পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাঁহার কীর্ত্তি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠে। তাঁহার যশোরাশি সুদূর পাশ্চাত্য সমাজেও প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়া, ইংলণ্ডের পণ্ডিতসম্প্রদায় বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

সমাজ যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, উহার মূলে যদি ধর্ম্মভাব নিবদ্ধ না থাকে, ধর্ম্মোৎপান্ন সভ্যতার বলে যদি উহা স্থিতিশীলতার পরিচয় না দেয়, তাহা হইলে অতি সামান্য সংঘর্ষেই উহার শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে। সমাজান্তরের সহিত উহার সংস্রব ঘটিলে, সেই সমাজের ভাল বিষয়গুলিও উহাতে বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করে। সুস্বাদু ফলের বীজ অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত হইলে যেমন সেই ফলের বৃক্ষ নিস্তেজ ও তদুৎপন্ন ফল বিস্বাদ হয়, সেইরূপ উন্নত ও উৎকৃষ্ট বিষয় উচ্ছৃঙ্খল সমাজে অবনতি ও অপকর্ষের পরিচায়ক হইয়া উঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সমাজ নিরতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী সাহিত্যের অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় এই

শৃঙ্খলাশূন্য সমাজে আপনাদের উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। ঐ সাহিত্যের স্নিগ্ধভাব ইংলণ্ডের সাহিত্যে অশ্লীল ভাবে পরিণত হইয়াছিল; সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য সন্দেহ ঘোরতর নাস্তিকভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল; বিয়োগান্ত নাটক আপনার প্রকৃতিসিদ্ধ মহান্ ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছিল; সংযোগান্ত নাটক অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতি ও প্রণয়ের পরিবর্ত্তে নিরতিশয় নির্লজ্জভাবের পরিচয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে ইংলণ্ডীয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ভিন্ন দেশের সাহিত্যের উদার ভাব কলঙ্কিত হইয়া উঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষ্টুয়ার্টবংশের সহিত ইংলণ্ডের সাহিত্যের এই কলঙ্ক অপগত হয়। সামাজিক শৃঙ্খলার সহিত ইংলণ্ডের সাহিত্যেও শৃঙ্খলাসম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা সাহিত্যের শৃঙ্খলাবিধানে তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইতিহাসে প্রতিভাশালী পুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। ফরাসী সাহিত্যের বিষয় যেমন এক সময়ে ইংলণ্ডের সাহিত্যে বিকৃত হইয়াছিল, ইংলণ্ডের সাহিত্যের বিষয় আমাদের সাহিত্যে সেইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। এক দিকে ধর্ম্মোৎপাদ্য প্রাচীন সভ্যতা, অপর দিকে অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বঙ্গীয় সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিল। নানারূপ বিপ্লবেও এই শৃঙ্খলার মূলোচ্ছেদ হয় নাই। বঙ্কিম আপনাদের সভ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এবং চিরবিশুদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের সম্মান রক্ষা করিয়া, ইংরেজী সাহিত্যের ভাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যিনি আপন সমাজের প্রকৃতি বুঝিয়া ভিন্নদেশীয় উন্নতিশীল সাহিত্যের উৎকৃষ্ট বিষয় স্বদেশের সাহিত্যে প্রকাশ করেন, তিনি নিঃসন্দেহ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। বঙ্কিম বঙ্গীয় সাহিত্যে এইরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। যাহাদের দূরদর্শিতা নাই, সমাজতত্ত্বে অভিজ্ঞতা নাই, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, তাহাদের হস্তে স্বদেশের বা বিদেশের যাবতীয় উৎকৃষ্ট বিষয়ই বিকৃত হইতে পারে। সামাজিক শৃঙ্খলার মধ্যেও এইরূপ

দুর্ম্মতি লেখকগণ শস্যসম্পত্তিশোভিত ক্ষেত্রে সামান্য তৃণগুচ্ছের ন্যায় সাতিশয় অসার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। বঙ্কিম সাহিত্যের বিশুদ্ধি ও গৌরব রক্ষার জন্য ইহাদিগকে কঠোর দণ্ডে শাসিত করিয়াছেন। তাঁহার কঠোর শাসনে অদূরদর্শী লেখকগণ সসম্ভ্রমে আত্মগোপন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য আবর্জ্জনায় শ্রীশূন্য না হইয়া, সমুজ্জ্বল বিশুদ্ধভাব প্রকাশ করিয়াছে।

যিনি এইরূপ ক্ষমতায় স্বদেশের জনসাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাবলী যে, অবিক্রীত থাকিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। গ্রন্থ বিক্রয়ে তাঁহার অর্থাগম হইত। কিন্তু তিনি অর্থের মায়ায় নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই। গ্রন্থলিখিত বিষয় পরে মনোনীত না হইলে, তিনি ঐ গ্রন্থের প্রচারে নিরস্ত থাকিতেন; বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি উহার পুনঃপ্রচার করিতেন না। এই কারণে তাঁহার 'সাম্য' পুনঃপ্রচারিত হয় নাই। একজন প্রসিদ্ধ পুস্তকব্যবসায়ী নিজ ব্যয়ে উহা মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব করিলেও তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার "বিজ্ঞানরহস্য"ও পুনঃ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বব্যাপিনী ছিল। তিনি স্বার্থের বশীভূত হইয়া সেই প্রতিভা কলঙ্কিত করেন নাই। উপন্যাসের চরিত্রচিত্রে, ইতিহাসের দুর্জ্জেয় বিষয়ের উদ্ধারে, গ্রন্থসমালোচনে, ধর্ম্মতত্ত্বের বিচারে, রহস্যের রসবিস্তারে, তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ঐ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি রাজকীয় কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন; যথোচিত রাজভক্তির সহিত স্বকীয় কার্য্য সম্পাদন করিলেও ঐ কার্য্যে তাঁহার সন্তোষ জন্মে নাই। দরিদ্র কেপ্লার বলিতেন যে, তিনি সাক্সনি প্রদেশের অধিকারী

হওয়া অপেক্ষা আপনার গ্রন্থাবলীর প্রণেতা বলিয়া পরিচিত হইতেই ইচ্ছা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হওয়া অপেক্ষা স্বদেশে গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইতে ভালবাসিতেন। যাহা হউক, তিনি যে, মাতৃভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, সহৃদয়সমাজ ইহা কখনও বিস্মৃত হইবে না। রাজকীয় কর্ম্মে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও, তিনি সংযত ভাবে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে অসামান্য উদ্যম ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। চাকরি করিলেও তিনি মাতৃভূমির কৃতী সন্তান। সন্তানোচিত কার্য্যে তিনি আপনার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, বঙ্কিম আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয় নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থ চিরকাল আমাদের সমাজকে আমোদের সহিত উপদেশ দিবে। কালের পরিবর্ত্তনে এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্যের আবির্ভাব হইতে পারে, এক জনপদের পর আর এক জনপদের অভ্যুদয় ঘটিতে পারে, এক জাতির পর আর এক জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের এই জাতীয় সম্বন্ধ কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিক্রমাদিত্যের রত্নসিংহাসন বিলুপ্ত হইয়াছে, কালিদাসের রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত নববিকশিত প্রভাতকমলের ন্যায় নবীনভাবে পরিপূর্ণ থাকিয়া, সহৃদয়দিগের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীও চিরদিন এইভাবে থাকিয়া প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলপ্রবাহের ন্যায় লোকের তৃপ্তিসাধন করিবে।

সম্পূর্ণ।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী, মেট্‌কাফ্ প্রেস্, ৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত গ্রন্থাবলী।

Approved by the Text Book Committee.

মাননীয় ভাইস-চেন্সেলার ও সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক ১৯১২,১৩,১৪,১৫ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন্ পরীক্ষার বাঙ্গালা কোর্স রূপে নির্দ্ধারিত ও ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স্ স্কুলের 3rd, 2nd ও 1st classএর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত।

১।	আর্য্যকীর্ত্তি		১।০
২	প্রতিভা	বাধান	১৲
৩	ভারতের ইতিহাস		১৲

For Matriculation Examination)

৪	রচনা	॥৶০
৫	রচনামালা	॥৶০
৬	ছাত্রপাঠ	॥৶০
৭।	ভীষ্মচরিত	॥০
৮।	প্রবন্ধমঞ্জরী	॥০
৯।	বীরমহিমা	॥০
১০।	ঐতিহাসিক পাঠ	॥০
১১।	ইংলণ্ডের ইতিহাস	॥০
১২।	প্রবন্ধকুসুম	॥০
১৩।	বিবিধ প্রবন্ধ	॥০
১৪।	প্রবন্ধমালা	।৶০
১৫।	নীতিপাঠ	।৶০
১৬।	আখ্যানমালা	।৶০
১৭।	বাঙ্গালার ইতিহাস	।০
১৮।	পাঠমঞ্জরী	।০
১৯।	কবিতাসংগ্রহ	।১
২০।	বোধবিকাশ	৶০
২১।	পদার্থবিদ্যা-প্রবেশ	৶০
২২।	নীতিহার	৶০

Recommended as Library Book by Government for all grades of schools E. B. and Assam.
(Cal. Gazt. 2· October, 1912.)

২৩। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস
(৫ ভাগে সম্পূর্ণ গ্রন্থকারের সচিত্র জীবনী সহ)

১ম ভাগ	(বাঁধান)	
২য় ভাগ	"	
৩য় ভাগ	"	৷৷৹
৪র্থ ভাগ	"	৷৷৹
৫ম ভাগ	"	

২৪। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ (সটীক বাঁধান)

২৫। ভারতকাহিনী

২৬। ভারতপ্রসঙ্গ

২৭। নবভারত ও বর্ত্তমান যুগের ভারতবর্ষ—
(Translation of Cotton "New India") ৷৷৹

২৮। পাণিনির বিচার ১৲

২৯। নব চরিত ৷৶৹

৩০। মেরি কার্পেণ্টার বাঁধান ৷৷৹

৩১। জয়দেবচরিত ৷৶৹

৩২। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

৩৩। হিন্দুর আশ্রম-চতুষ্টয়

৩৪। আমাদের জাতীয় ভাব

সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি
৩০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।